ছাত্রদের প্রতি

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

অনুবাদক

শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

এক মহত্তর জীবনাদর্শের উপলব্ধির পথে
প্রথম প্রেরণা যাঁর কাছে পেয়েছিলাম,
ভারতীয় ছাত্র ও যুব সংগঠনের অন্যতম পথিকৃৎ,
আনন্দমেলার বন্ধু সেই "মৌমাছি"র করকমলে—

ভূমিকা

গান্ধীজীর সঙ্গে ছাত্রজগতের সম্পর্ক স্থাপিত হয় বহুদিন পূর্বে। দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনকালে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জোহনস্-বার্গের নিকট টলস্টয় ফার্মের স্থাপনা করেন। এখানে সত্যাগ্রহীরা কঠোর কৃচ্ছ্রতা-মূলক জীবন যাপন করত। সাধারণ অর্থে "শিক্ষা" বলতে যা বোঝায়, তার দায়িত্ব এই সময় গান্ধীজীব উপর পড়ে। টলস্টয় ফার্মের অল্পবয়স্ক বালক-বালিকাদের শিক্ষা দেবার আংশিক ভার তাঁকে বহন করতে হয়। এইভাবে এক অভিনব জীবন-যাত্রা পদ্ধতির প্রয়োজনেব তাগিদে গান্ধীজীকে শিক্ষাক্ষেত্রে তাঁর 'প্রয়োগ' সুরু করতে হয়। আর তার ফলে তাঁর চতুর্দিকস্থ অহিংস সংগ্রামের পরিবেশের প্রভাবে ও স্বীয় উদার দৃষ্টিভঙ্গির কল্যাণে শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণ মতবাদ এবং ছাত্রদের কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁর ধারণা-সমূহ ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে।

নৈতিকতা গান্ধীজীর জীবন-দর্শনের অন্যতম স্তম্ভস্বরূপ হওয়ায় বরাবরই ছাত্র-সমাজকে তিনি সংযম-পালনের প্রয়োজনীয়তা বোঝাবার চেষ্টা করে এসেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ব্রহ্মচর্য ছাড়া কেউই নিজেকে জনসমাজের আদর্শ সেবকে রূপায়িত করতে পারে না এবং সেইজন্য ব্রহ্মচর্যের বাণী প্রচারে তিনি কখনও ক্লান্তি বোধ করেন নি। বস্তুতঃ তিনি একবার এমন কথাও লেখেন যে, তিনি স্বয়ং বিবেকবোধ-সম্পন্ন কর্মী হলেও কখনও কখনও বাসনা তাঁর কর্মক্ষমতাকে ব্যাহত করেছে। তাঁর নিজের সীমা সম্বন্ধে এইরূপ সচেতনতা তাঁকে সংযমাভিমুখী করেছে। তাঁর যুক্তি হচ্ছে "সত্যোপলব্ধির জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণকে স্বার্থলেশশূন্য হতে হবে। এদের সন্তান-প্রজনন এবং সংসার-প্রতিপালনের মত স্বার্থপূর্ণ কাজে মগ্ন হবার সময় থাকতে পারে না।" (যারবেদা মন্দির হইতে—পৃষ্ঠা ১৭)। কিন্তু সংযমের উপর এতটা গুরুত্ব দেওয়ার ফলে প্রায়ই তাঁকে এ বিষয়ে ভিন্ন মতাবলম্বীদের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছে। তবুও নৈষ্ঠিক নীতিবাদের প্রতিনিধি স্বরূপ তিনি তাঁর স্বভাবোচিত সাহসিকতার সঙ্গে অদম্য উৎসাহে সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন।

যাই হোক, তাঁর নবীন-বয়স্ক শ্রোতৃমণ্ডলীর কাছে তিনি যা বলতে চাইতেন, তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, তারা যেন তাদের গুরুভার সামাজিক দায়িত্বের কথা নিজ মনশ্চক্ষুর সামনে চিরজাগরূক রাখে। ছাত্ররা হচ্ছে সমাজেরই অঙ্গ এবং তাদের শিক্ষার ব্যয় ছাত্রদের শ্রমদ্বারা নির্বাহ হয় না। সমগ্র সমাজকে এই ব্যয়ভার বহন করতে হয়। আর আমাদের মত দরিদ্র দেশে স্বভাবতই এই ভারের অধিকাংশ

পড়ে লক্ষ লক্ষ অবহেলিত ও শোষিত গ্রামবাসীর উপর। এই সকল গ্রামবাসী দেহ ও মনের অন্ধকারার মাঝে নির্বাসিত। সুতরাং ছাত্রদের প্রাথমিক কর্তব্য হচ্ছে ছাত্রাবস্থাকে মানসিক বিলাসিতায় লিপ্ত হবার সুযোগ বলে মনে না করা। বরং আজ যাদের স্কন্ধারূঢ় হয়ে তারা বিরাজমান, শেষ পর্যন্ত তাদের সেবার জন্য আত্মোৎসর্গের প্রস্তুতির মুহূর্ত বলে মনে করতে হবে এই বিদ্যার্জনের কালকে। এই ঋণ পরিশোধের একটি সরল ও সহজসাধ্য উপায় হচ্ছে, পঠনকালেই যে কোন একটি কারুশিল্প শিক্ষা করা এবং নিজ শ্রমদ্বারা উৎপন্ন দ্রব্যে তাদের শিক্ষাকালীন ব্যয়-ভারের যতটুকু পারা যায় উপার্জন করা। এইভাবে শিক্ষণকালে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ হলে পল্লীপ্রধান ভারতবর্ষে শিক্ষার বিকীরণ হবার পথে যথেষ্ট সহায়তা মিলবে, কারণ প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতির অভাবে গ্রামে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব নয় বলে বলা হয়।

গান্ধীজী ছাত্রদের এ পরামর্শও দিয়েছিলেন যে, যেসব গ্রামের মাঝে তাদের বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত, তার অধিবাসীদের সঙ্গে ছাত্রদের যেন নিয়মিত সংযোগ থাকে। ছাত্রদের শুধু সহানুভূতির দ্বারা পরিচালিত হয়ে গ্রামবাসীদের আর্থিক ও সামাজিক বাধা সম্বন্ধে তথ্যান্বেষণ করলেই চলবে না, এর সঙ্গে সঙ্গে গ্রামের আর্থিক ও নৈতিক মানের উন্নতির জন্যও তাদের সক্রিয় ভাবে কিছু করতে হবে। গান্ধীজী এই অভিলাষ পোষণ করতেন যে, এ কার্য সাধনের জন্য ছাত্ররা উপলব্ধি ও উদ্যম সহকারে চরকা ধরবে এবং এই চরকাকে তারা বিশ্বের তাবৎ শ্রমজীবী জনতার সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী যোগসূত্র স্বরূপ মনে করবে।

এই সাধারণ উৎপাদনমূলক শ্রমের মাধ্যমে শ্রমজীবীদের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ছাত্ররা নিরক্ষরতা দূর করবে এবং স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা আদি সম্বন্ধে গ্রামবাসীদের শিক্ষা দেবে। পণপ্রথা এবং অস্পৃশ্যতার মত নিষ্ঠুর রীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ছাত্রদের সমাজ-সংস্কারের নায়ক হতে হবে।

কিন্তু আমাদের মত পরাধীন দেশে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে ছাত্রদের এর চেয়েও একটি গুরুতর দায়িত্ব আছে। বহু ছাত্র এ বিষয়ে গান্ধীজীর উপদেশপ্রার্থী হয়। তিনি তাদের সকলকে যুক্তিবাদী মনোবৃত্তি গড়ে তোলার পরামর্শ দিতেন এবং বলতেন যে, তারা যেন সকলের বক্তব্য শ্রবণ করে ও আসল ও নকলের পার্থক্য ধরতে পারে এবং সর্বোপরি তারা যেন দলগত রাজনীতি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত থাকে। ছাত্ররা যেন তাদের কর্তব্যে ব্রতী থাকে এবং নৈতিকতা সম্বন্ধে তাদের মৌলিক বিশ্বাসের সঙ্গে সংঘর্ষ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তারা যেন তাদের প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত থাকে। সর্বব্যাপক রাষ্ট্র-

বিপ্লবের সময় তাদের পাঠ্যপুস্তক রেখে দিয়ে সৈনিকের মত সে আন্দোলনে যোগদান করতে হবে। সারা ঘরে যখন আগুন লাগে তখন সকলেই জলপাত্র হস্তে অবিলম্বে করণীয় কর্তব্য পালনে অগ্রসর হয়। সময় সময় গান্ধীজীর মনে এই ইচ্ছা জাগত যে, চীনের মত আমাদের ছাত্রসমাজও যেন সকল কর্মের অগ্রদূত হয়। জাতীয় সংগ্রামকালে যুদ্ধক্ষেত্রই হবে তাদের জ্ঞানার্জনের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়।

সংক্ষেপে বলতে গেলে গান্ধীজী এই ভাবে ছাত্রসমাজকে সেবামূলক আত্মদান ও শোষিত জনতার সঙ্গে ক্রমবর্ধমান একাত্মতার পথে সুসংবদ্ধভাবে নিয়ে যেতে চাইতেন, যাতে ছাত্ররা তাদের সেবা দ্বারা এদের এই ঘন ঘোর তমিস্রা থেকে উদ্ধার করে। এই হচ্ছে জীবনের পরমারাধ্য ধ্যেয় এবং শিক্ষার অন্তিম লক্ষ্য হচ্ছে বয়োপ্রাপ্তিকালে ছাত্রদের এই গুরুদায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হবার যোগ্য করে গড়ে তোলা।

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট প্রবন্ধাবলী এবং গান্ধীজীর বক্তৃতা ও রচনার উদ্ধৃতি-সমূহের কালানুক্রমিক সমাবেশ করা হয়েছে। গান্ধীজী ছাত্রসমাজের জন্য যে বহুমুখী সামাজিক কর্তব্য এবং সুমহান আদর্শ নির্ণয় করে গেছেন, এ গ্রন্থ যথোচিত অভি-নিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করলে অবশ্যই তা পাঠকের মনে প্রভাব সৃষ্টি করবে। যে কোন সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানরূপী লক্ষ্য তাদের কাছে কঠিন বলে মনে হওয়া উচিত নয় এবং দীন-দরিদ্রের জন্য তাদের কাছে যে ত্যাগের দাবী তিনি জানিয়েছেন, তার পরিমাণ হ্রাস করারও কোন কারণ নেই।

গান্ধীজী তাঁর জীবদ্দশায় ভারতের ছাত্রসমাজ সম্বন্ধে যে বিশ্বাস পোষণ করতেন, তারা যেন তার যোগ্য হয়।

কলিকাতা   নির্মলকুমার বসু

৪-৪-১৯৪৮

উপক্রমণিকা

যে কোন প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে সমাজ জীবনে নবীন স্থিতি ও নব মূল্যবোধ স্থাপনা করতে হলে প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে লোকমানসের পরিবর্তন সাধন ; এবং এই নূতন মনোভাবকে লোকজীবনে স্থায়ী রূপ দেবার জন্য এর পর প্রয়োজন হয় অনুকূল সামাজিক কাঠামো রচনা করা। নচেৎ লোকচরিত্রে পরিবর্তন আনার চেষ্টা না করে বা এই কর্মসূচীকে অগ্রাধিকার না দিয়ে যেন তেন প্রকারেণ বস্তুস্থিতির বাহ্ রূপান্তর ঘটালে, হয় নবীনাদর্শের উদ্যোক্তাদের অবর্তমানে সেই উচ্চ জীবনাদর্শ অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়, আর নয়ত এই প্রক্রিয়ার অবসানে দেখা যায় যে যাত্রী পথভ্রান্ত হয়ে মূল লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এই ভুলের পুনরাবৃত্তি আমরা বার বার দেখেছি। তাই অতীত প্রয়োগের ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষাগ্রহণ করে আমাদেরই দেশের যে মহামানব মহান সাধ্য প্রাপ্তির জন্য সাধনশুদ্ধির উপর জোর দিয়ে বিপ্লব বা ক্রান্তি আবাহনের পন্থায় বিপ্লব সাধন করলেন, তাঁর নাম মহাত্মা গান্ধী। লৌহবাসরের সূচিকাপ্রমাণ ছিদ্রপথে অনুপ্রবেশ করে কাল-ভুজঙ্গ যাতে মানবসমাজের বহুদিনের কঠোর তপস্যা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অকাল মৃত্যু ঘটাতে না পারে, তারই জন্য গান্ধীজী বিচারক্রান্তির উপর এত গুরুত্ব আরোপ করলেন। নবীন বিচারধারা লোকমানসে আসন পরিগ্রহ করলে জাগ্রত জনমত স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে প্রাচীন প্রথার বন্ধনমুক্ত হয়ে সমাজ-দেউলে নবীন দেবতার আরাধনা করবে। এবং এ আবাহন হবে দীর্ঘকালস্থায়ী ও এর প্রক্রিয়াও হবে সর্বাপেক্ষা স্বল্প-আয়াস-সাধ্য।

আর্থিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রিক লক্ষ্যের ক্ষেত্রে চিরকাল মতদ্বৈধতার অবকাশ থেকে যাবে। কিন্তু এ বিষয়ে মতভেদ নেই যে অকর্মণ্য সৈনিক দ্বারা কঠিন রণে জয়লাভ অসম্ভব। তাই যে মতেরই হোক না কেন, নিজ অভীষ্ট সাধনের জন্য নিপুণ যোদ্ধা অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মী প্রয়োজন। আত্মসংযম ও আদর্শ নৈতিক চরিত্রনিষ্ঠা ছাড়া এ যোগ্যতা অর্জন করা যায় না। প্রত্যহের ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র দায়িত্ব পালনে অক্ষম এবং সামান্য প্রলোভনে আদর্শচ্যুত কর্মী নিশ্চয় কোন জাদুমন্ত্র প্রভাবে বিপ্লবের লেলিহান বহ্নিশিখার মাঝে ঐ বিশৃঙ্খল অবস্থায় অনুশাসন ও আদর্শবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে পড়বে না। সেইজন্য যে মহামানবের সমগ্র জীবনই সত্যলোকাচারী এক অনির্বাণ হোমশিখা, তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ প্রবচন সর্ব মত ও পথের ছাত্র ও তরুণদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে

যোগ্যতার সঙ্গে চলার উপযুক্ত পাথেয়র সন্ধান দেবে, এতে সন্দেহ নেই। সতত অনুশীলন ও নিয়ত প্রচেষ্টার দ্বারা ষড়-রিপুর দাস এই নরমানব কতটা উর্দ্ধে উঠতে পারে, তারই জলন্ত নিদর্শন মহাত্মা গান্ধী। তিনি সর্বকালের সর্ব মানবের প্রেরণার উৎস এবং সর্বযুগে তাঁকে মানবতা-পরিমাপের মানদণ্ড রূপে বিবেচনা করা হবে। ভবিষ্যতের দায়িত্বভার যাদের উপর পড়বে, তাদের জন্য তিনি কোন্ পথ ছকে দিয়েছিলেন, তা সেই কারণে উত্তরোত্তর অধিকতর মহত্ত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে।

বাঙলার ছাত্র- ও তরুণ-সমাজের হাতে এই মহাপুরুষের উপদেশ পৌঁছে দেবার সম্পূর্ণ গৌরব এই গ্রন্থের প্রকাশকদের প্রাপ্য। এই মহৎ প্রচেষ্টার জন্য তাঁরা প্রতিটি বঙ্গভাষাভাষীর কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন সন্দেহ নেই। শ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ, পি-এইচ-ডি, মহাশয় আমার প্রতি অসীম স্নেহবশতঃ এই গ্রন্থের কয়েকটি পরিভাষা রচনা কার্যে পরামর্শ দিয়েছেন। কল্যাণীয়া শ্রীমতী গীতা ধর অশেষ পরিশ্রম সহকারে এর পাণ্ডুলিপি তৈরী করে দিয়েছেন। এঁদের সঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের সম্পর্ক নয় বলে শুধু ঋণ স্বীকার করেই ক্ষান্ত হলাম।

আর একটি কথা, গ্রন্থের কলেবর অত্যধিক স্ফীত হবার আশঙ্কায় মূল পুস্তকের কয়েকটি অধ্যায় বর্জন করেছি এবং কোন কোন স্থলে ঈষৎ সম্পাদনা করতে হয়েছে।

অঃ ভাঃ সর্ব সেবা সঙ্ঘ
পোঃ খাদিগ্রাম, মুঙ্গের।
৩০শে জানুয়ারী, ১৯৫৮

শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ছাত্রদের প্রতি

ছাত্রদের সঙ্গে আমি বরাবরই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছি। তারা আমাকে জানে এবং আমি তাদের জানি। তাদের কাছ থেকে আমি কাজ পেয়েছি। কলেজের অনেক প্রাক্তন ছাত্র আমার অন্তরঙ্গ সহকর্মী। আমি জানি যে তারাই হচ্ছে ভবিষ্যৎ আশাস্থল। অসহযোগের গৌরবোজ্জ্বল দিনে তাদের স্কুল-কলেজ ছেড়ে চলে আসতে আহ্বান জানিয়েছিলাম। অনেক অধ্যাপক ও ছাত্র যারা কংগ্রেসের ডাকে সাড়া দিয়েছিল এবং এখনও যারা দৃঢ়তা সহকারে নিজ কর্তব্য করে যাচ্ছে, তারা দেশের যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করেছে এবং নিজেরাও উপকৃত হয়েছে। আর সে আহ্বানের পুনরাবৃত্তি করা হয়নি, কারণ দেশের অবস্থা সেরকম নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, বর্তমান শিক্ষা মিথ্যা ও অস্বাভাবিক হলেও দেশের যুব-সম্প্রদায়ের কাছে এর প্রলোভন অতীব তীব্র। কলেজী শিক্ষার ফলে ভবিষ্যৎ জীবনের সুরাহা হয়। মন্ত্রমুগ্ধদের দলে ঢুকে পড়ার অনুমতিপত্র এ। গতানুগতিক পন্থায় না চললে সাধারণ পর্যায়ের জ্ঞান-পিপাসা মেটে না। মাতৃভাষার পরিবর্তে সম্পূর্ণ এক বিদেশী ভাষার জ্ঞানার্জনের জন্য যে বহুমূল্য সময় নষ্ট হয়, তার প্রতি কোন রকম ভ্রূক্ষেপ করা হয় না। এ পাপ কখনই অনুভূত হয় না। ছাত্রসমাজ ও তাঁদের শিক্ষকগণ স্থির করে নিয়েছেন যে, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশ করার ব্যাপারে দেশীয় ভাষা সমূহ সম্পূর্ণ অযোগ্য। আমি ভেবেই পাই না যে, জাপানের কাজকর্ম চলছে কেমন করে! কারণ আমি যতদূর জানি, তারা জাপানী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পেয়ে থাকে। চীনের জেনারেলিসিমো ইংরাজী প্রায় জানেন না বললেই চলে।

কিন্তু ছাত্রদের বর্তমান অবস্থা মেনে নিলেও একথা ঠিক যে, এই সব নবীন নরনারীর ভিতর থেকেই ভবিষ্যৎ নেতৃবৃন্দের সৃষ্টি হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের মধ্যেও বিভিন্ন শক্তির ঘাত-প্রতিঘাত চলছে। অহিংসার প্রতি তাদের আকর্ষণ অতি অল্প। এক ঘুষির বদলে আরও একটি বা দুটি ঘুষির কথা তারা সহজেই বোঝে। এর পরিণাম অস্থায়ী হলেও তারা মনে করে যে, এতে দ্রুত ফললাভ হয়। এ হচ্ছে পশু বা মানবজাতির যুদ্ধকালীন সতত বিরাজমান পাশব শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অহিংসার পৃষ্ঠপোষকতার অর্থ হচ্ছে ধৈর্যের সঙ্গে অনুসন্ধিৎসা এবং আচরণের ক্ষেত্রে এর অর্থ হচ্ছে অধিকতর কষ্ট ও তিতিক্ষার পরিচয় দেওয়া। কিন্তু আমি নিজেই হচ্ছি-তাদের সমগোত্রীয় ছাত্র এবং কিঞ্চিৎ ব্যাপক অর্থে এই বিশ্বই আমার বিদ্যালয়।

তাদের ও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্থক্য আছে। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করার জন্য এবং আমার গবেষণার সহকর্মী হবার জন্য তাদের আমি স্থায়ী আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। তবে এ আমন্ত্রণ নিম্নরূপ সর্তে—

১। দলগত রাজনীতিতে ছাত্ররা কোনক্রমেই অংশ গ্রহণ করবে না, তারা হচ্ছে বিদ্যার্থী এবং তথ্যান্বেষক—রাজনীতিবিদ্ নয়।

২। রাজনৈতিক কারণে ধর্মঘট করা তাদের উচিত হবে না। নেতা অবশ্য তাদের থাকবে, তবে নেতার প্রতি তারা অনুরাগ দেখাবে তাঁর সৎগুণাবলীর অনুকরণ করে। তাদের নেতাকে জেলে দিলে বা নেতা মারা গেলে বা এমন কি তাঁর ফাঁসি হলেও তারা ধর্মঘট করবে না। দুঃখ যদি তাদের অসহ্য মনে হয় এবং সমস্ত ছাত্রের বুকেই সমানভাবে তা বাজে, তবে সে ক্ষেত্রে অধ্যক্ষের সম্মতি নিয়ে বিদ্যালয় বা কলেজ বন্ধ করা যেতে পারে। অধ্যক্ষ কর্ণপাত না করলে যথোচিত শিষ্টাচার সহকারে ছাত্রেরা বিদ্যানিকেতন ছেড়ে চলে যেতে পারবে এবং কর্তৃপক্ষ অনুতাপ প্রকাশ করে তাদের পুনরায় না ডেকে পাঠানো পর্যন্ত তারা ফিরে আসবে না। বিরুদ্ধমতাবলম্বী ছাত্র বা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কখনই তারা বলপ্রয়োগ করবে না। এ বিশ্বাস তাদের থাকা চাই যে, সংহতি সম্পন্ন হলে এবং তাদের আচরণ সৌজন্যপূর্ণ হলে তাদের বিজয় অনিবার্য।

৩। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তারা ত্যাগের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে সুতো কাটবে। তাদের সাজ-সরঞ্জাম সর্বদাই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং সাজানো গোছানো থাকবে। সম্ভব হলে তারা নিজেরাই সেসব তৈরী করবে। স্বভাবতই তাদের সুতো খুব উঁচুদবের হবে। সুতো কাটার আর্থিক, সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক ইত্যাদি যাবতীয় দিকগুলি সম্বন্ধে যেসব বই আছে, তারা সেগুলি পড়বে।

৪। তারা আগাগোড়া খাদি ব্যবহার করবে এবং কলে তৈরী বা বিদেশী জিনিসের বদলে গ্রাম্যপণ্য ব্যবহার করবে।

৫। অপরের উপর তারা "বন্দেমাতরম্" বা "জাতীয়-পতাকা" জোর করে চাপাবে না। জাতীয় পতাকার ছবিযুক্ত প্রতীক তারা নিজেরা ব্যবহার করতে পারে তবে অপরকে অনুরূপ প্রতীক ব্যবহারের জন্য চাপ দেবে না।

৬। ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকার বাণী তারা নিজেরা বহন করবে এবং তাদের মনে সাম্প্রদায়িকতা বা ছুঁৎমার্গের ভাব থাকবে না। প্রিয়জনের মত নিজেরা অন্য ধর্মাবলম্বী এবং হরিজন ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনা করবে।

৭। আহত প্রতিবেশীর প্রাথমিক পরিচর্যা অবশ্যই তারা করবে এবং নিকটস্থ গ্রামে তারা সাফাই এবং আবর্জনা পরিষ্কারের কাজ করবে ও গ্রামের শিশু ও

বয়স্কদের তারা শিক্ষা দেবে।

৮। রাষ্ট্রভাষা হিন্দুস্থানী তারা সবাই শিখবে এবং এর বর্তমান যুগ্মরূপ অর্থাৎ দু'ধরণের কথন ও লিখন পদ্ধতিও তারা জানবে। এর ফলে হিন্দি বা উর্দু—যাই বলা হোক না কেন এবং নাগরী ও উর্দু যে কোন লিপিই লেখা হোক না কেন, তারা কোন অসুবিধাই ভোগ করবে না।

৯। নতুন কিছু যা তারা শিখবে, তা তারা মাতৃভাষায় অনুবাদ করবে এবং নিকটস্থ গ্রামগুলিতে সাপ্তাহিক পরিক্রমার সময় সেই নতুন জ্ঞান ছড়িয়ে দেবে।

১০। কোন কিছুই তারা গোপন করবে না, তাদের যাবতীয় আচরণ খোলাখুলি হবে। তারা আত্মসংযমমূলক পবিত্র জীবনযাপন করবে, সমস্ত ভয় বিসর্জন দেবে ও সহপাঠী দুর্বল ছাত্রদের রক্ষা করার জন্য সর্বদাই প্রস্তুত থাকবে, এবং জীবন পণ করেও অহিংস পন্থায় দাঙ্গা দমনের জন্য তারা তাদের বিদ্যানিকেতন ছেড়ে বেরিয়ে আসবে ও প্রয়োজন হলে দেশের স্বাধীনতার জন্য নিজেদের উৎসর্গ করবে।

১১। সহপাঠিনী ছাত্রীদের সঙ্গে তারা যথোচিত ন্যায়সঙ্গত ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করবে।

ছাত্রদের যে কার্যক্রম আমি ছকে দিয়েছি, তাকে কার্যে পরিণত করার জন্য তাদের সময় করে নিতে হবে। আমি জানি যে কুড়েমি করে তারা বহু সময় নষ্ট করে। প্রকৃত মিতাচারের ফলে তারা সময় বাঁচাতে পারে। তবে কোন ছাত্রের উপর আমি অসঙ্গত চাপ দিতে চাই না। কোন দেশপ্রেমিক ছাত্রকে এক নাগাড়ে আমি তাই একটি বছর নষ্ট করতে বলব না। তার সমস্ত বিদ্যাভ্যাস কালের মধ্যে তাকে এই এক বছর দিতে বলব। তারা দেখবে যে এভাবে এক বছর দেওয়ায় সময় নষ্ট হয়নি। এ প্রচেষ্টায় তাদের মানসিক নৈতিক এবং শারীরিক উপকরণের পরিমাণ বৃদ্ধি হবে এবং পঠদ্দশায় তারা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যথেষ্ট অবদান রেখে যেতে পারবে।

পুণা — মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

১৩-১১-১৯৪৫

সূচীপত্র

ছাত্রদের প্রতি

১। সন্ত্রাসবাদী অপরাধ *

যদিচ শ্রীযুক্ত গান্ধীর গুরু পরলোকগত গোখেলের এই নির্দেশ ছিল যে এদেশে থাকাকালীন তিনি তাঁর কান খোলা রেখে মুখ বন্ধ রাখবেন, তথাপি ঐ সভায় কিছু বলার প্রলোভন তিনি সম্বরণ করতে পারলেন না। বক্তা এবং তাঁর স্বর্গবাসী গুরু উভয়েরই অভিমত হচ্ছে এই যে, রাজনীতি ছাত্রদের কাছে নিষিদ্ধ বস্তু হতে পারে না। কারণ তিনি ছাত্রদের রাজনীতি বোঝার এবং তাতে ভাগ না নেবার কোন কারণ বুঝে উঠতে পারেন না। রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন করা অনুচিত বলা যেতে পর্যন্ত তিনি প্রস্তুত ছিলেন। তিনি আশা প্রকট করেছিলেন যে, তাদের শিক্ষক, অধ্যাপক এবং সভার মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের সঙ্গে তারা এ বিষয়ে একমত হবে যে, সবল চরিত্র গড়ে তুলতে না পারলে শুধু আক্ষরিক শিক্ষার কোন মূল্য নেই। এ কথা কি বলা যেতে পারে যে, দেশের ছাত্র সম্প্রদায় বা জনসাধারণ সম্পূর্ণরূপে নির্ভয়? বিদেশে অবস্থান করলেও এই প্রশ্নটি বক্তার মনে গভীর চিন্তার উদ্রেক করত। রাজনৈতিক দস্যুতা বা রাজনৈতিক হত্যার অর্থ তিনি বুঝতেন। এ বিষয়ে যথোচিত অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করার পর তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, যদিও তাঁর স্বদেশীয় কিছু সংখ্যক ছাত্রের মন উদ্দীপনার বহ্নি-শিখা এবং মাতৃভূমির প্রতি প্রেমে পরিপূর্ণ, তথাপি স্বদেশ প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা ছাত্রদের জানা নেই। তিনি শুনেছেন যে তাদের মধ্যে কেউ কেউ হীনপন্থার আশ্রয় গ্রহণ করে। এর কারণ এই যে তারা ভগবানকে ভয় করার বদলে মানুষকে ভয় করে। তিনি আজ এই জন্যই তাদের সামনে দাঁড়িয়েছেন যে, রাজদ্রোহের সমর্থক হলে তিনি প্রকাশ্যভাবেই সে কথা ঘোষণা করবেন এবং এর পরিণতি সাদরে বরণ করবেন। এরকম করলে সমগ্র পরিবেশের মধ্যে আর মিথ্যাচারের স্পর্শ থাকবে না। ছাত্ররা শুধু ভারত কেন সারা সাম্রাজ্যের আশাস্থল। তারা যদি ঈশ্বরের ভয়ে কাজ করার পরিবর্তে ব্রিটিশ বা স্বদেশীয় সরকারের ভয় দ্বারা পরিচালিত হয়, তবে

* ১৯১৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে কলকাতার কলেজ স্কোয়ার স্টুডেন্টস হলে প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্তসার।

তার ফল সারা দেশের পক্ষে হানিকর বলে পরিগণিত হবে। পরিণাম যাই হোক না কেন, তারা সদা সর্বদা মনের দরজা খোলা রাখবে। ডাকাতি বা নরহত্যার সঙ্গে যুক্ত যুবকেরা ভ্রান্তপথে পরিচালিত এবং এসব কাজের সঙ্গে তাদের কোনরকম সম্বন্ধ থাকা অনুচিত। এই সব ব্যক্তিদের তারা দেশ ও তাদের নিজেদের শত্রু বলে মনে করবে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তিনি এমন কথা বলছেন না যে, তাদের ঘৃণা করা উচিত। বক্তার গভর্ণমেণ্টের উপর বিশ্বাস নেই এবং তিনি কোনরকম গভর্ণমেণ্টের পক্ষপাতি নন। তিনি বিশ্বাস করেন যে সেই সরকারই সর্বশ্রেষ্ঠ যা সর্বাপেক্ষা কম শাসন করে। তবে তাঁর ব্যক্তিগত বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা না তুলে তিনি একথা অবশ্যই বলবেন যে, ভ্রান্তপথে পরিচালিত যে উদ্যম ডাকাতি এবং নরহত্যা করে, তার দ্বারা কোন সুফল লাভ করা যায় না। এইসব লুণ্ঠন ও নরহত্যা এ দেশে সম্পূর্ণ নূতন জিনিস। এ প্রথা এদেশে শিকড় গাড়বে না বা স্থায়ী ব্যবস্থা বলে পরিগণিত হবে না। হত্যায় যে কোন মঙ্গল হয় না, ইতিহাস তার সাক্ষী। এ দেশের হিন্দু-ধর্মের তাৎপর্য হচ্ছে হিংসা থেকে বিরত থাকা, অর্থাৎ জীবহত্যা না করা। তাঁর মতে এই নীতিই হচ্ছে সকল ধর্মের মূল কথা। হিন্দুধর্ম তো একথাও বলে যে, পাপীকে ঘৃণা কোরো না। হিন্দুধর্ম বলে যে, পাপীকেও হত্যা করার অধিকার কারও নেই। রাজনৈতিক হত্যাকে পাশ্চাত্য প্রথা বলে অভিহিত করে বক্তা তাঁর শ্রোতৃমণ্ডলীকে এইসব পাশ্চাত্য পদ্ধতি ও পশ্চিম দেশীয় পাপ সম্বন্ধে সতর্ক করে দেন। পাশ্চাত্য জগতে এর ফলে কি লাভ হয়েছে ? যুব সম্প্রদায় যদি এর অনুকরণ করে ও মনে করে যে এর দ্বারা ভারতের বিন্দুমাত্র উপকার হবে, তবে তারা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত—এ কথা বলতে হবে। ব্রিটিশের শাসন ব্যবস্থায় সংস্কারের যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে মনে করা সত্ত্বেও আজ তিনি এ কথার আলোচনা করতে চান না যে, ব্রিটিশ, না ভারতের প্রাচীন পদ্ধতি—কোন্ ধরণের শাসন ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা হিতকর। তবে তাঁর তরুণ বন্ধুদের তিনি অবশ্যই এ পরামর্শ দেবেন যে তারা যেন নির্ভীক ও সৎ হয় এবং ধর্মীয় নীতি যেন তাদের পরিচালনা করে। দেশকে যদি তারা কোন কর্মসূচী দিতে চান, তবে খোলাখুলি তা জনসাধারণের সামনে পেশ করা উচিত। সভায় সমাগত তরুণ-তরুণীদের ধর্মভাবাপন্ন হতে এবং ধর্মবোধ ও নৈতিকতার দ্বারা পরিচালিত হবার আবেদন জানিয়ে বক্তা তাঁর বক্তব্য শেষ করলেন। তারা যদি মরতে প্রস্তুত থাকে তবে বক্তাও তাদের সঙ্গে মৃত্যু বরণ করবেন। তিনি তাদের নেতৃত্ব মেনে নেবেন। তবে দেশে আতঙ্ক ছড়ালে তিনি তাদের বিরোধী হবেন।

[সভাপতি তাঁর সুললিত ভাষণে সন্ধ্যায় প্রদত্ত বক্তৃতার প্রশংসা করতঃ মন্তব্য

করেন যে, এ দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ দূরীকরণের জন্য যুব-সম্প্রদায়ের সংঘবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। বক্তৃতার জন্য শ্রীযুক্ত গান্ধীকে তিনি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।]

২। গুরুকুলে *

অভীমন্ত্র

সফরকালে সর্বদা আমাকে ভারতের অবিলম্বে প্রয়োজনীয় জিনিস কি—এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। সর্বত্র আমি এ প্রশ্নের যে উত্তর দিয়েছি এখানেও আজ তার পুনরুক্তি করলে অন্যায় হবে না বলে মনে হয়। মোটামুটি বলতে গেলে ভারতের সর্বাপেক্ষা ও অবিলম্বে প্রয়োনীয় জিনিস হচ্ছে উপযুক্ত ধর্মীয় চেতনা। তবে আমি এ কথা জানি যে এ উত্তর একেবারে বৈশিষ্ট্যহীন বলে এতে কেউ সন্তুষ্ট হবেন না। অথচ এ উত্তরের ভিতর সর্বকালের সত্য নিহিত আছে। সুতরাং আমি যা বলতে চাই, তা হচ্ছে এই যে, আমাদের ভিতব ধর্মীয় চেতনা সুপ্ত হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে আমরা সর্বব্যাপী ভীতির মধ্যে ডুবে আছি। আমরা জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক, এই দুই দিকেরই কর্তৃপক্ষকে ভয় করি। পুরোহিত ও পণ্ডিতদের কাছে আমরা মনের কথা বলার সাহস পাই না। ইহজাগতিক প্রভুদের সম্বন্ধে আমরা সম্ভ্রম মিশ্রিত আতঙ্ক বোধ করি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে এতে আমরা তাঁদের এবং আমাদের নিজেদেরও ক্ষতি করি। ধর্মজীবনের গুরু বা রাজনৈতিক ক্ষেত্রের শাসক —এঁরা নিশ্চয় চান না যে, তাঁদের কাছে সত্য গোপন করা হোক। সম্প্রতি বোম্বাইএ বক্তৃতা প্রসঙ্গে লর্ড উইলিংডন মন্তব্য করেছেন যে, আমরা সত্যসত্যই "না" বলার কথা ভাবলেও সে কথাটি উচ্চারণ করতে ইতস্ততঃ করি এবং এই জন্য তিনি শ্রোতৃমণ্ডলীকে নির্ভীকতার অনুশীলন করতে পরামর্শ দিয়েছেন। অবশ্য নির্ভীকতার অর্থ এ নয় যে অপরের মনোভাবের অসম্মান বা অমর্যাদা করা। আমার বিনত অভিমত হচ্ছে এই যে, দেশে সত্যকার স্থায়ী কিছু মঙ্গল করার পূর্বে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নির্ভীকতা। ধর্মীয় চেতনা ছাড়া এ গুণ অর্জন করা সম্ভব নয়। আমরা যেন ভগবানকে ভয় করি, তাহলেই মানুষকে ভয় করার স্বভাব ছাড়তে পারব। আমরা যদি এই কথাটি উপলব্ধি করতে পারি যে, আমাদের ভিতর এমন এক ঐশ্বরিক শক্তি বিদ্যমান, যা আমাদের সকল চিন্তা ও কার্যের সাক্ষী এবং যে শক্তি

* গুরুকুলের বাৎসরিক সম্মেলনে প্রদত্ত গান্ধীজী কর্তৃক লিখিত বক্তৃতা হইতে গৃহীত।

আমাদের সর্বদা সযত্নে রক্ষা করে ও সত্যপথে পরিচালিত করে, তাহলে ভগবান ছাড়া এ পৃথিবীতে আর কাউকেই আমরা ভয় করব না। রাজ্যপালদের প্রতি-পালকের প্রতি আনুগত্য হচ্ছে সর্ববিধ আনুগত্যের সেরা এবং আনুগত্যের একটা যুক্তিসঙ্গত অর্থ বিদ্যমান।

স্বদেশীর তাৎপর্য

অভিমন্ত্রের যথোচিত অনুশীলনের পর আমরা দেখতে পাব যে খাঁটি স্বদেশী মনোবৃত্তি ছাড়া আমাদের মুক্তির উপায় নেই। এ স্বদেশীকে সুযোগ মত মুলতুবী রাখা যায় না। আমার কাছে স্বদেশী কথাটির অর্থ এর চেয়ে গভীর। আমি একে আমাদের ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং আর্থিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে চাই। সুতরাং সময় বিশেষে স্বদেশী বস্ত্র পরিধান করে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে না। স্বদেশী বস্ত্র তো আমাদের সর্বদাই পরতে হবে। তবে ঈর্ষা বা প্রতিশোধ গ্রহণের মনোবৃত্তি দ্বারা চালিত হয়ে আমরা এমন করব না। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমির প্রতি কর্তব্য-পরায়ণতা বশতই আমরা স্বদেশী কাপড় মাথায় তুলে নেব। বিদেশী বস্ত্র পরিধান করলে অবশ্যই স্বদেশী মনোবৃত্তিচ্যুত হতে হয়; কিন্তু বিদেশী ছাঁটকাটের পোশাক পরলেও ঐ একই রকমের দোষ হয়। আমাদের পোশাকের ধরণের সঙ্গে নিঃসন্দেহে আমাদের পরিবেশের সম্বন্ধ বিদ্যমান। রুচি এবং সৌষ্ঠবের দিক থেকে দেশী পোশাক নিঃসন্দেহে ট্রাউজার বা জ্যাকেটের চেয়ে শ্রেয়। ট্রাউজারের বাইরে দোদুল্যমান সার্ট এবং তার উপর নেকটাই বিহীন অবস্থায় খোলা ফ্ল্যাপের ওয়েস্ট কোট চাপান ভারতবাসীকে দেখে মনে সম্ভ্রমের উদ্রেক হয় না। ধর্মের ক্ষেত্রে স্বদেশী-বোধ আমাদের অতীত গৌরব সম্বন্ধে সচেতন হতে এবং তাকে বর্তমান যুগোপযোগী করতে শেখায়। ইউরোপের অসংবদ্ধ অবস্থা দৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে আধুনিক সভ্যতা হচ্ছে অমঙ্গল এবং তামসিকতার প্রতিভূ। কিন্তু প্রাচীন অর্থাৎ ভারতীয় সভ্যতা মূলত ঐশ্বরিক শক্তির উত্তরসাধক। বর্তমান সভ্যতা প্রধানত বস্তুতান্ত্রিক; কিন্তু আমাদের সভ্যতা আধ্যাত্মিকতা ভিত্তিক। জড় জগতের গতিসূত্র সম্বন্ধে গবেষণা এবং মানব প্রতিভাকে উৎপাদনের সাধন ও ধ্বংসের আয়ুধ আবিষ্কারে নিয়োগ করা হচ্ছে আধুনিক সভ্যতার কাজ। কিন্তু আমাদের প্রধান কাজ হচ্ছে আধ্যাত্মিক সূত্র আবিষ্কার। আমাদের শাস্ত্ররাজী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এ কথা ঘোষণা করে যে, ন্যায়-ভিত্তিক জীবনযাত্রার জন্য যথাবিহিত ভাবে সত্য অনুসরণ, পবিত্র জীবন যাপন, সর্বজীবে দয়া এবং অস্তেয় ও অপরিগ্রহ ব্রতপালন অপরিহার্য। আমাদের শাস্ত্রমতে এতদ্ব্যতিরেকে সেই "সত্যম্‌শিবম্‌ ও সুন্দরমের" অনুভূতি লাভ

অসম্ভব। আমাদের সভ্যতা অপরিসীম নিঃসংশয়তা সহকারে ঘোষণা করে যে অহিংসা অর্থাৎ পবিত্র প্রেম ও দয়া বৃত্তির যথাযথ অনুসরণে সমগ্র বিশ্ব আমাদের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হবে। এই মহান আবিষ্কারের নায়ক এ নীতিতে বিশ্বাস সৃষ্টির মত বহু উদাহরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

অহিংসনীতি

রাজনৈতিক জীবনে এর ফল পরীক্ষা করে দেখ। আমাদের শস্ত্রমতে জীবনের চেয়ে মূল্যবান অবদান আর কিছুই নেই। আমাদের শাসকদের জীবনের সম্পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করতে পারলে তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা কেমন হবে, তা একবার ভেবে দেখ। তাদের মনে একবার যদি এই বিশ্বাস জাগে যে তাদের আচরণ সম্বন্ধে আমরা যে মনোভাবই পোষণ করি না কেন, তাদের দেহকে আমরা নিজদেহের মতই পবিত্র বোধ করব, তাহলে অবিলম্বে আমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাসের আবহাওয়া সৃষ্টি হবে এবং উভয়পক্ষের মধ্যেই এমন অকপটতা দেখা দেবে যে, আজকের বহুবিধ জটিল সমস্যার সম্মানজনক ও ন্যায়সঙ্গত সমাধানের পথ রচিত হবে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, অহিংসা আচরণের কালে অহিংস প্রতিদান পাবার আশা মনে রাখলে চলবে না, অবশ্য শেষ পর্যন্ত এ পথে অহিংস প্রতিদান পাওয়া অবশ্যম্ভাবী। অনেকের মত আমিও বিশ্বাস করি যে আমাদের সভ্যতার মারফৎ জগতকে আমরা নূতন এক বাণী শোনাবার ক্ষমতা রাখি। নিছক স্বার্থের খাতিরেই আমি ব্রিটিশ সরকারের অনুগত। ব্রিটিশ জাতিকে আমি অহিংসার শক্তিদীপ্ত বাণী সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত করে দেবার কাজে লাগাতে চাই। তবে আমাদের তথাকথিত বিজেতাদের জয় করার পরই একাজে হাত দেওয়া যেতে পারে। আর এ কাজের জন্য আমার মনে হয় যে, উপস্থিত আর্যসমাজী বন্ধুরাই সর্বাধিক যোগ্যতাসম্পন্ন। আমাদের ধর্মগ্রন্থসমূহ তোমরা খুঁটিয়ে পড় বলে দাবী কর এবং কোন কিছু তোমরা স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নাও না ও নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী চলতে তোমাদের মনে দ্বিধা নেই বলে বল। অহিংসা নীতিকে তাচ্ছিল্য করার মত বা এর গণ্ডীকে সীমাবদ্ধ করার কোনরকম ক্ষেত্র আছে বলে আমার মনে হয় না। সুতরাং অবিলম্বে কি প্রতিদান পাচ্ছ তার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে তোমরা অহিংসানীতিকে জীবনে মূর্ত করার সাহস মনে আন। এতে অবশ্য তোমাদের বিশ্বাসের অগ্নি পরীক্ষা হবে। এর দ্বারা তোমরা শুধু ভারতের মুক্তি আনবে না, একজন মানুষের পক্ষে সমগ্র মানবতাকে সর্বাধিক প্রেম যে সেবা দেওয়া সম্ভব, তাই তোমরা দেবে এবং মহাপ্রাণ দয়ানন্দ স্বামীর ব্রতকেও

তোমরা এইভাবে সফল করবে। এই স্বদেশী মন্ত্রকে অতীব সক্রিয় শক্তি বলে জানবে এবং ক্রমবর্ধমান আত্মবিশ্লেষণ ও সতর্কতা সহকারে এর প্রয়োগ করতে হবে। অলসের জন্য এ ধর্ম নয়, সত্যের জন্য সানন্দে যারা জীবনপাত করবে, এ ধর্ম হচ্ছে শুধু তাদেরই। স্বদেশীর অন্যান্য দিক সম্বন্ধে আরও বিশদ ব্যাখ্যা করা যেতে পারে; কিন্তু মনে হয় যে আমার বক্তব্য বোঝবার মত যথেষ্ট বলা হয়েছে। আমি শুধু এইটুকুই আশা করি যে তোমাদেব মত দেশ-সংস্কারকের দল যথেষ্ট বিবেচনা না করে আমার কথাকে নাকচ কববে না। আব আমার কথা যদি তোমাদেব মনঃপুত হয়ে থাকে তবে তোমাদের যে অতীত ইতিহাস আমি জানি, তাতে আমি আশা কবব যে, আজ আমি যে শাশ্বত সত্য সম্বন্ধে তোমাদের বললাম, সেই সত্যকে তোমরা নিজ জীবনে মূর্ত কববে এবং সমগ্র ভাবতবর্ষকে তোমাদের কর্মক্ষেত্র করবে।

কলেজী যুবক

বিগত দুই-তিন বৎসবে যে সব ছেলে কলেজ ছেড়ে বেবিয়েছে তাবা কি করে তা দেখতে হবে। কাজ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে জনসাধাবণ কোন মানুষ বা প্রতিষ্ঠানেব বিচাব কবে না বা কবতেও পাবে না। ব্যর্থতা এখানে ক্ষমা পায় না এবং এই বিচাবকেব বিচার হয় নিক্তিব ওজ'ন। গুরুকুল এবং জনসাধাবণ দ্বারা সমর্থিত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেব চুড়ান্ত বিচার হবে এই ভাবে। কলেজ ছেড়ে যেসব ছাত্র জীবনের বন্ধুব ক্ষেত্রের প্রবেশ পথে এসে দাঁড়িয়েছে, তাদেব উপব তাই গুরুদায়িত্ব। তারা যেন সতর্ক হয়। সঙ্গে সঙ্গে যাঁবা এই মহান পবীক্ষার প্রতি সহানুভূতিশীল তাঁরা এই কথাটি জেনে সন্তুষ্টি লাভ কবতে পারেন যে, প্রকৃতির নিয়মই হচ্ছে এই যে, ফল হবে গাছেব মত। গাছটি তো এখন দেখতে সুন্দর, যাঁরা এই বৃক্ষে বারি সিঞ্চন করেছেন, তাঁবা মহাপ্রাণ ব্যক্তি। এর ফল কেমন হবে তা নিয়ে এখন থেকে চিন্তার কি আছে?

শরীর শ্রম ও সাফাই

গুরুকুলে প্রেমিক হিসাবে আমি এবাব এব পবিচালনা সমিতি ও অভিভাবকদের কয়েকটি পরামর্শ দেব। গুরুকুলেব ছেলেদেব আত্মপ্রত্যয়শীল ও স্বাবলম্বী করে গড়ে তুলতে হলে তাদের প্রয়োজনীয় শ্রমশিল্পের শিক্ষা দেওয়া দরকার। আমাদের মত যে দেশে শতকরা ৮৫ জন কৃষিজীবি এবং সম্ভবত শতকরা আরও ১০ জন কৃষককুলের প্রয়োজনীয় দ্রব্য উৎপাদনের কাজে নিযুক্ত, সেখানে আমার মতে কৃষিকার্য ও বুনাই সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান প্রতিটি যুবকের শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ

হওয়া উচিত। হাতের কাজের হাতিয়ারপত্র ঠিক ভাবে চালাতে শিখলে বা একটুকরা কাঁচকে সোজাসুজি চিরতে জানলে অথবা ঠিকমত গুনিয়া টেনে মজবুত দেওয়াল গাঁথতে পারলে তো তার কোন ক্ষতি নেই। এই রকম অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোন ছেলে জীবন সংগ্রামে কোন দিন নিজেকে অসহায় বোধ করবে না এবং কখনও সে বেকার থাকবে না। স্বাস্থ্যতত্ত্ব, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং শিশুপালন সম্বন্ধেও গুরুকুলের ছাত্রদের জ্ঞান থাকা দরকার। এখানকার মেলার সাফাইএর ব্যবস্থা অসম্পূর্ণ। মক্ষিকা বাহিনী দেখলেই সব কথা বোঝা যায়। এই সব দুর্দম সাফাইকার্য পরিদর্শকের দল আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, সাফাইএর ব্যবস্থা ক্রটীশূন্য নয়। এরা আমাদের সোজাসুজি এই শিক্ষা দিচ্ছে যে ভুক্তাবশেষ এবং আবর্জনাসমূহ ঠিকভাবে মাটি চাপা দিতে হবে। আমার এই কথা ভেবে দুঃখ হচ্ছিল যে, মেলার বাৎসরিক দর্শকদের স্বাস্থ্যতত্ত্ব ও সাফাই বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ শিক্ষা দেবার এমন একটি সুযোগ হাতছাড়া হয়ে গেল। কিন্তু একাজের সূচনা করতে হবে ছেলেদের দিয়েই। তাহলে কর্তৃপক্ষ এরপর বাৎসরিক সম্মেলনে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন তিনশত সাফাই বিজ্ঞান শিক্ষক পাবেন। সর্বশেষে বললেও সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হবে এই যে, অভিভাবক এবং পরিচালন সমিতি যেন তাঁদেব ছেলেদের ইউরোপীয় পোশাকের অন্ধ অনুকরণ করতে দিয়ে ও আধুনিক বিলাসের দ্রব্যসম্ভার জুগিয়ে ধ্বংসের রাস্তা না খুলে দেন। ভবিষ্যত জীবনে তারা এসবের ফলে কষ্ট পাবে এবং এসব আচরণ ব্রহ্মচর্যনীতি বিরুদ্ধও বটে। আমাদের মধ্যে যেসব কুপ্রথা বিদ্যমান, তার বিরুদ্ধেই তাদের যথেষ্ট সংগ্রাম করতে হবে। তাদের লোভ বাড়িয়ে দিয়ে সে সংগ্রামকে আমরা যেন কঠোরতর না করি।

৩। ছাত্রদের প্রতি উপদেশ *

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এবং প্রিয় বন্ধুবর্গ,

আমার এবং আমার পত্নীর প্রশংসার জন্য মাদ্রাজ সত্য সত্যই ইংরাজী ভাষার শব্দ সম্ভার উজাড় করে প্রয়োগ করেছে এবং আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় যে,

* ছাত্রদের অভিনন্দনের উত্তরে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল ওয়াই, এম, সি, এতে প্রদত্ত বক্তৃতা, অনারেবল শ্রীযুক্ত ভি, এস, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী সভায় সভাপতিত্ব করেন।

কোথায় আমার প্রতি অপরিসীম স্নেহ, ভালবাসা বস্তু বর্ষণ করা হয়েছে, তাহলে আমাকে বলতেই হবে যে, তা হচ্ছে মাদ্রাজ। (হর্ষধ্বনি) তবে প্রায়ই আমি একথা বলে থাকি যে এটা হচ্ছে মাদ্রাজের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আপনারা যে অতুলনীয় মহত্ত্বের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে অকৃপণভাবে এইরকম প্রীতির ধারা প্রবাহিত করবেন এতে আর আশ্চর্যের কি আছে? আমি যে সার্ভেণ্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির শিক্ষানবিশ, স্বয়ং তার সুযোগ্য সভাপতি মহোদয় এই অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করায় এবারে আমার প্রতি মাদ্রাজের স্নেহ ও সৌজন্যের চূড়ান্ত নিদর্শন পাওয়া গেছে বলে মনে করছি। আমি কি এসবের যোগ্য? অন্তরের অন্তস্তল থেকে শুধু প্রবল কণ্ঠের "না" কথাটি এর জবাবস্বরূপ ধ্বনিত হচ্ছে। তবে আমি ভারতবর্ষে এসেছি, আপনারা যেসব বিশেষণ প্রয়োগ করবেন তার যোগ্য হতে এবং আমি যদি সুযোগ্য সেবক হতে চাই, তাহলে আমার সমগ্র জীবনকে অবশ্যই এর যোগ্য হবার জন্য উৎসর্গ করতে হবে।

আপনারা একটু পূর্বে সুললিত ছন্দে গ্রথিত আমাদের জাতীয় সঙ্গীত গাইলেন এবং তখন আমরা সবাই আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলাম। মাতৃস্বরূপা ভারতবর্ষকে বর্ণনা করার জন্য কবি তাঁর বিশেষণের ভাণ্ডার বোধহয় শূন্য করে ফেলেছেন। ভারতমাতাকে তিনি সুহাসিনী, সুমধুরভাষিনী, সুখদা, বরদা, সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা এবং অতীতের স্বর্ণযুগের নরনারী অধ্যুষিত দেশ বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি আমাদের নয়নের সম্মুখে এমন এক পবিত্র ভূমির চিত্র অঙ্কন করছেন, যে দেশ সমগ্র বিশ্বকে তার কণ্ঠলগ্ন করবে এবং আসুরিক শক্তির দ্বারা নয়, আত্মিক বলে এই দেশ সমগ্র মানব সমাজকে নিজের প্রতি আকর্ষণ করবে। এই মন্ত্র কি আমাদের কণ্ঠে ধ্বনিত হবে? নিজেকে আমি প্রশ্ন করি: "এ মহাসঙ্গীত শ্রবণকালে আমার কি উঠে দাঁড়াবার অধিকার আছে?" কবি অবশ্য আমাদের অনুভূতি শক্তিকে জাগ্রত করার জন্য এমন একটি আলেখ্য সৃষ্টি করেছেন, যার শব্দগুলি বর্তমানে ভবিষ্যৎ-কল্পনার অতিরিক্ত কিছু নয়। কিন্তু আমাদের মাতৃভূমির রূপ বর্ণনায় কবি যে সব শব্দ নিচয় প্রয়োগ করেছেন, তাদের বাস্তব ক্ষেত্রে মূর্ত করার দায়িত্ব পড়েছে ভারতের আশাস্থল তোমাদের উপর। আজ হয়তো মনে হতে পারে যে মাতৃভূমির রূপ বর্ণনে এই সব বিশেষণ ব্যবহার করা অপ্রাসঙ্গিক; কিন্তু কবি আমাদের মাতৃভূমির জন্য যে গৌরব দাবী করেছেন, তার যথার্থতা প্রমাণ করার দায়িত্ব আমাদের সকলের উপর।

যথার্থ শিক্ষা

মাদ্রাজ তথা সমগ্র ভারতের ছাত্রগণ ! তোমরা কি এমন এক শিক্ষা গ্রহণ করছ, যা তোমাদের পূর্বোক্ত মহান আদর্শ সাধনে সহায়তা দেবে এবং তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গুণরাজির বিকাশ ঘটাবে, না তোমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা শুধু সরকারী কর্মচারী ও সওদাগরী অফিসের কেরানী উৎপাদন করার যন্ত্রস্বরূপ ? সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে চাকরি সংগ্রহ করাই কি শুধু তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য ? এই যদি তোমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হয় এবং একে যদি তোমরা নিজ জীবনের আদর্শ-রূপে বরণ করে থাক, তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, কবির মনশ্চক্ষুর সম্মুখে যে কল্পনা ছিল, তা কোন দিনই বাস্তবে পরিণত হবে না। তোমরা হয়তো শুনেছ বা হয়তো আমার রচনাবলী দ্বারা অবগত হয়েছ যে, আমি আধুনিক সভ্যতার প্রবল বিরোধী। ইউরোপে যা চলেছে আমি তার প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। তোমরা যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হও যে, বর্তমান সভ্যতার পদভারে ইউরোপ ত্রাহি রব ছাড়ছে, তাহলে সেই সভ্যতাকে আমাদের মাতৃভূমিতে আমদানি করার আগে তোমাদের এবং তোমাদের পূর্বজদের গভীর ভাবে চিন্তা করতে হবে। তবে আমাকে কেউ কেউ এ কথাও বলেন যে, আমাদের শাসকরা সেই সভ্যতা এ দেশে আমদানি করার ফলে এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না। এ সম্বন্ধে কোন ভ্রান্তধারণা পোষণ করো না। এক মুহূর্তের জন্যও আমি একথা মনে করি না যে নিজেরা দীক্ষিত হতে না চাইলে আমাদের শাসকরা সে সভ্যতাকে আমাদের দেশে প্রবর্তন করতে পারে এবং যদি ধরে নেওয়া যায় যে আমাদের শাসকরা এই সভ্যতাকে আমাদের সামনে পেশ করল ; তাহলেও আমি বলব যে আমাদের ভিতর এমন শক্তি আছে যার বলে শাসকদের বাতিল না করেও আমরা সে সভ্যতাকে বর্জন করতে পারি। (হর্ষধ্বনি) বহুবার বক্তৃতা উপলক্ষ্যে আমি বলেছি যে ব্রিটিশ জাতি আমাদের মধ্যে রয়েছে। কেন যে তারা আমাদের মাঝে আছে সে সম্বন্ধে আজ আমি আলোচনা করব না। তবে আমি এ কথা বিশ্বাস করি যে মাননীয় সভাপতি মহোদয়ের মুখে ভারতের যেসব প্রাচীন ঋষিদের কথা শুনলেন, তাঁদের পথে চললে আমরা এই মহান ব্রিটিশ জাতির মারফৎ বিশ্বে এক নবীন বাণী প্রচার করতে পারব। এ বাণীর সঙ্গে আসুরিক শক্তির সম্বন্ধ নেই, এ হবে প্রেমের বাণী। তারপর আপনারা রক্তপাত বিনা শুধু উচ্চতর আধ্যাত্মিক শক্তিতে বিজয়ীদের জয় করবেন। আজকে ভারতে যেসব ঘটনা ঘটছে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে রাজনৈতিক হত্যা এবং ডাকাতির সম্বন্ধে আমাদের অভিমত ব্যক্ত করা উচিত বলে আমি মনে করি। আমার বিশ্বাস এ পদ্ধতি বিদেশ থেকে আমদানি করা এবং এদেশে কোন দিনই

এদের শিকড় গাড়তে পারবে না। কিন্তু তোমাদের ছাত্রসমাজ যাতে এজাতীয় সন্ত্রাসবাদের প্রতি মানসিক বা নৈতিক সমর্থন না জানায় তার জন্য তোমাদের সতর্ক থাকতে হবে। একজন অহিংস প্রতিরোধকারী হিসাবে আমি তোমাদের এর বিকল্প একটি আয়ুধ দেব। নিজেকে সন্ত্রস্ত করে তোল, আত্মানুসন্ধান কর। অত্যাচার ও অবিচার যেখানেই দেখবে তার প্রতিরোধ কর। তোমাদের স্বাধীনতা খর্বকারী প্রতিটি প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে সর্বশক্তি নিয়োগে সংগ্রাম কর, কিন্তু তার জন্য অত্যাচারীর রক্তপাত কবার প্রয়োজন নেই। আমাদের ধর্মের শিক্ষা এ নয়। আমাদের ধর্মের ভিত্তি অহিংসাব উপর এবং এর সক্রিয় রূপ হচ্ছে ভালবাসা। এ ভালবাসা শুধু প্রতিবেশীর প্রতি নয়, এ প্রেম শুধু সুহৃদের জন্য নয়, শত্রুর প্রতিও প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করা হচ্ছে এ প্রেমেব ধর্ম।

এ বিষয়ে আর একটি কথা বলব। আমাব মনে হয় সত্য ও অহিংসা আচরণ কবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখতে হবে যে আমরা যেন নির্ভীকতার পূজারী হই। আমরা যদি দেখি আমাদের শাসকবর্গ অন্যায় করছেন এবং আমাদের যদি মনে হয় যে রাজদ্রোহী আখ্যা পেলেও আমাদের পরামর্শ শাসকদের গোচরীভূত করা উচিত, তাহলে আমি বলব যে তোমরা রাজদ্রোহই প্রচার কর। তবে দুঃখভোগের জন্য প্রস্তুত হয়ে তোমবা এ কাজ করবে। যখন দেখা যাবে যে তোমরা কৃতকর্মের ফলভোগে প্রস্তুত অথচ কারও প্রতি অন্যায় আঘাত হানছ না, আমার মনে হয় যে তখন তোমাদের ভিতর সবকারকেও তোমাদের পরামর্শ শুনতে উদ্বুদ্ধ করার শক্তি জন্মাবে।

অধিকার ও কর্তব্য

আমি নিজেকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে যুক্ত করেছি ; কারণ আমি বিশ্বাস করি যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিটি প্রজার সঙ্গে সমান অংশীদার হবার দাবী আমার আছে। আজ আমি সেই সমান অংশীদারত্ব দাবী করি। আমি কোন পদানত জাতির লোক নই। নিজেকে আমি পরাধীন জাতির লোক বলি না। তবে কথা হচ্ছে এই যে, ব্রিটিশ শাসকরা তোমাদের এ অবিকার দেবে না ; এ অধিকার তোমাদের অর্জন করতে হবে। কোন জিনিস চাইবার এবং নেবার ক্ষমতা আমার আছে। আমার পক্ষে এটা সম্ভব শুধু নিজ কর্তব্য সম্পাদন দ্বারা। ম্যাক্সমূলার বলেছেন (অবশ্য আমাদের নিজ ধর্মের ব্যখ্যার জন্য ম্যাক্সমূলারের কাছে যাবার প্রয়োজন নেই) আমাদের ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে ক-র্ত-ব্য, এই তিনটি শব্দের উপর। অ-ধি-কা-র নামক চারটি শব্দের উপর নয়। এবং তোমরা যদি মনে কর যে,

আমরা যা কিছু চাই, তা অধিকতর সুষ্ঠুভাবে কর্তব্য সম্পাদন দ্বারা পেতে পারি, তাহলে সর্বদা এই পথেই চিন্তা করতে হবে ও এপথে সংগ্রাম করার সময় ঈশ্বর ছাড়া কোন মানুষকে ভয় করার প্রয়োজন নেই। এই বাণীই আমাকে আমার গুরু (এবং হয়তো আপনাদেরও গুরুও) গোখলে আমাদেব দিয়েছেন। তাহলে এই বাণীর স্বরূপ কি? সারভেন্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির নিয়মাবলীর পুস্তকে এই নীতি-বাক্য লেখা আছে এবং এই বাণী অনুসারে আমি নিজ জীবন পরিচালন করতে চাই। দেশের রাজনৈতিক জীবন ও প্রতিষ্ঠানে আধ্যাত্মিকতার সঞ্চার করাই হচ্ছে সেই বাণী। এই আদর্শকে কার্যান্বিত করাব জন্য আমাদের অবিলম্বে অগ্রসর হতে হবে। ছাত্ররা রাজনীতির সঙ্গে অসম্পৃক্ত থাকতে পারে না। তাদের কাছে রাজনীতি ধর্মেব মতই অপরিহার্য। রাজনীতিকে ধর্মনীতির থেকে পৃথক করা যায় না। আমি জানি যে তোমরা হয়তো আমার মত মেনে নেবে না। কিন্তু আমাব অন্তবেব প্রত্যন্ত প্রদেশে যে ভাবেব আলোডন হচ্ছে, আমি শুধু তারই পরিচয় দিতে পাবি। দক্ষিণ আফ্রিকায় লব্ধ অভিজ্ঞতার আধারে আমি তোমাদেব এই কথা দৃঢ়তা সহকাবে বলতে পারি যে আধুনিক সভ্যতাব সংস্পর্শ-বিহীন তোমাদের দেশবাসীর ভিতর উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাচীনকালের ঋষিদের তপশ্চর্যাব প্রভাব থাকায় ইংরাজী সাহিত্যের একটিমাত্র কথাও জানা না থাকা সত্বেও এবং বর্তমান সভ্যতা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হওয়া সত্বেও তারা পূর্ণ শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদের অশিক্ষিত এবং অক্ষর পবিচযহীন দেশবাসীর পক্ষে যা সম্ভব হয়েছে, তার অন্তত দশগুণ তোমাদেব ও আমাদের পক্ষে ভারতেব এই পুণ্যভূমিতে আজ করা সম্ভব। তোমবা এবং আমি যেন সেই গৌরবের অধিকারী হতে পাবি। (হর্ষধ্বনি)

৪। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা *

বন্ধুগণ,

এখানে পৌছাতে খুব বেশী দেরি হবার জন্য আমি সর্বান্তঃকরণে ক্ষমাপ্রার্থী। তোমরা যদি শোন যে এই বিলম্বের জন্য আমি বা কোন মানুষ দায়ী নয়, তাহলে আমার বিশ্বাস তোমবা আমাকে অবিলম্বে ক্ষমা করবে (হাস্য)। ব্যাপার হচ্ছে এই যে আমি যেন কোন সার্কাসের জন্তু এবং আমার রক্ষণাবেক্ষণকাবীরা আমার প্রতি করুণার আধিক্যে প্রায়ই জীবনপথের এই কথাটা ভুলে যান যে মানুষেব

* ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন উপলক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ।

জীবনে দুর্ঘটনারও স্থান আছে। এই ক্ষেত্রে তাঁদের এবং আমাদের কাহনটিকে পরপর যেসব দুর্ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়, তার কথা তাঁরা পূর্ব হতে হিসাব করেন নি। তার ফল স্বরূপ এই বিলম্ব।

সুহৃদবৃন্দ! এইমাত্র যে মহিলা (শ্রীমতী বেসান্ত) তাঁর অতুলনীয় বাগ্মীপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে আসন গ্রহণ করলেন, তার বক্তৃতার প্রভাবে তোমরা যেন এ ভুল করো না যে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং এই নব-নির্মীয়মান বিশ্ববিদ্যালয়ের ছত্রছায়ায় জ্ঞানার্জনের জন্য যেসব যুবক-যুবতীর আসার কথা, তারা এখানকার পাঠাভ্যাস সমাপ্ত করে এক মহান সাম্রাজ্যের দায়িত্বশীল নাগরিক হয়ে এখান থেকে বিদায় নিয়েছে। তোমরা যেন এ জাতীয় কোন ভুল ধারণা নিয়ে এখান থেকে না যাও। আজকে সন্ধ্যায় আমার বক্তৃতা তোমাদের এই ছাত্র সমাজের উদ্দেশ্যে। তোমরা যদি এক মুহূর্তের জন্যও এ কথা মনে করে থাক যে, যে আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য এ দেশ প্রসিদ্ধ এবং যে কারণে এ দেশের জুড়ি কোথাও নেই, সেই আধ্যাত্মিক জীবনের পরশ শুধু মুখের কথায় অন্তের ভিতর এনে দেওয়া যায়, তাহলে সাম্নুনয়ে আমি তোমাদের বলব যে তোমরা ভুল করছ। ভারত একদিন বিশ্বকে যে নবীন বাণী শোনাবে, তা শুধু মুখের কথায় হবে না। নিজেই আমি ভাষণ ও বক্তৃতায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছি। তবে গত দুদিন যাবৎ এখানে এই ধরণের যে সব বক্তৃতা দেওয়া হয়েছে, তা প্রয়োজনীয় বলে আমি মনে করি। কিন্তু এ কথাও আমি তোমাদের বলব যে, আমাদের বক্তৃতাবাজীর অবসান ঘনিয়ে আসছে এবং এখন শুধু দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে খোরাক দিয়ে কাজ শেষ হবে না, এবার আমাদের হৃদয়তন্ত্রীতে অনুরণন সৃষ্টি করতে হবে এবং আমাদের হস্তপদাদি অঙ্গ সঞ্চালন করতে হবে। গত দুইদিন যাবৎ আমরা শুনেছি যে, ভারতীয় চরিত্রের সরলতা বজায় রাখার জন্য হৃদয়ের সঙ্গে একতালে হস্তপদের সঞ্চালন করা আমাদের পক্ষে কত প্রয়োজন। কিন্তু এ তো হল আমার বক্তব্যের ভূমিকা।

আজ সন্ধ্যায় এই পবিত্র নগরীতে এই মহান বিদ্যাপীঠের ছত্রছায়ায় যে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে তাতে আমি এক বিদেশী ভাষার মাধ্যমে আমার মনোভাব স্বদেশবাসীর কাছে ব্যক্ত করছি বলে আমার লজ্জা ও অপমানের সীমা নেই। এই দুইদিন ধরে যেসব ছাত্র এই বক্তৃতা শ্রবণ করছে, আমাকে যদি তাদের পরীক্ষা নিতে হয়, তবে আমি জানি যে তাদের মধ্যে অধিকাংশই অকৃতকার্য হবে। এর কারণ কি? কারণ বক্তৃতা তাদের মর্মস্পর্শ করে নি। গত ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের যে বিরাট অধিবেশন হয়, আমি তাতে উপস্থিত ছিলাম। এখানকার চেয়েও অনেক বেশী দর্শক সেখানে ছিল এবং তোমরা বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, শুধু হিন্দুস্থানীতে

প্রদত্ত বক্তৃতাগুলিই বোম্বের সেই বিপুল সংখ্যক দর্শকের হৃদয় স্পর্শ করেছিল। স্মরণ রেখো যে, এই ঘটনা ঘটেছিল বোম্বেতে, বেনারসের মত সকলে যেখানে হিন্দী বলে, সেখানে নয়। ইংরাজীর সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন ভাষার যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান, বোম্বের আঞ্চলিক ভাষা এবং হিন্দীর মধ্যে সেই ব্যবধান নেই। সুতরাং কংগ্রেসের অধিবেশনে সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলী হিন্দী বক্তৃতা বেশ ভাল ভাবেই বুঝতে পেরেছিল। আমি আশা করি যে ছাত্ররা যাতে নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা করে এই বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখবে। আমাদের ভাষা হচ্ছে আমাদেরই প্রতিচ্ছবি এবং তোমরা যদি বল যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাব প্রকাশের বাহন হিসাবে আমাদের ভাষা দুর্বল, তবে আমার মতে যত তাড়াতাড়ি ধরাপৃষ্ঠ থেকে আমাদের অস্তিত্ব মুছে যায়, ততই মঙ্গল। আমাদের মধ্যে কেউ কি এমন আছে যে মনে করে ভারতের রাষ্ট্রভাষার স্থান ইংরেজী পাবে? (না—না ধ্বনি) জাতির চলার পথে এই দাবী সৃষ্টি করা কেন? একবার ভেবে দেখ যে ইংরেজ ছেলেদের তুলনায় আমাদের ছেলেদের কি রকম বি-সম প্রতিযোগিতায় নামতে হচ্ছে। পুণার জনকয়েক অধ্যাপকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তাঁরা দৃঢ়তা সহকারে এই কথা জানালেন যে, ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে হয় বলে প্রত্যেকটি ভারতীয় যুবককে জীবনের ছয়টি মূল্যবান বৎসর নষ্ট করতে হয়। প্রতিটি স্কুল ও কলেজে যে সংখ্যক ছাত্র পড়ে, তাকে ছয় দিয়ে গুণ দিলে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে যে, জাতির কত সহস্র বৎসর অপচয় হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়ে থাকে যে, আমাদের প্রেরণাশক্তি নেই। বিদেশী ভাষা আয়ত্ব করার জন্য এমন মূল্যবান সময় নষ্ট করলে আর প্রেরণাশক্তি আসবে কোথা থেকে? সুতরাং এ প্রচেষ্টায় আমরা ব্যর্থতা বরণ করে নিই। গতকাল এবং আজকের বক্তাদের মধ্যে মিঃ হিগিনবুথামের মত আর কারও পক্ষে কি শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয় জয় করা সম্ভবপর হয়েছে? শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে দাগ কাটতে সমর্থ না হবার অপরাধ পূর্বোক্ত বক্তাদের নয়। তাঁদের বক্তৃতায় আমাদের পক্ষে যথেষ্ট মনের খোরাক ছিল। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে নি। আমি অনেককে এ কথা বলতে শুনেছি যে ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিরাই তো জাতির নেতৃত্বের দায়িত্ব বহন করেছেন। এর বিপরীত ঘটাটাই আশ্চর্যের বিষয়। দেশের একমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থাই হচ্ছে ইংরাজীর মাধ্যমে। তাই নিঃসন্দেহেই এর কিছু না কিছু ফল দৃষ্টি-গোচর হবেই। কিন্তু আমরা যদি গত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা পেতাম, তাহলে এর পরিণাম কি হত? আজ আমরা তাহলে স্বাধীন দেশের নাগরিক হতাম এবং আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজ গৃহে পরবাসীর মত

হত না, জাতির প্রাণ-স্পন্দনের সঙ্গে তাঁদের যোগ থাকত। দেশের দীন-দরিদ্র ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁরা কাজ করতে সমর্থ হতেন এবং এই অর্ধ শতাব্দীতে তাঁরা যা অর্জন করতেন, তাকে সমগ্র জাতির সম্পদ ও ঐতিহ্য আখ্যা দেওয়া যেত। (হর্ষধ্বনি) আজ শিক্ষিতবর্গের অর্ধাঙ্গীরা পর্যন্ত তাঁদের স্বামীর মহানতম চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত নন। অধ্যাপক বসু এবং অধ্যাপক রায়ের গৌরবময় গবেষণার উদাহরণ নিন। এটা কি লজ্জার বিষয় নয় যে তাঁদের গবেষণা সর্বসাধারণের সম্পত্তি নয়?

এবার অন্য একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক।

কংগ্রেস স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে এবং আমি নিঃসন্দেহ যে, নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটি এবং মুসলীম লীগও তাদের কর্তব্য সম্পাদনার্থ এই জাতীয় কোন বাস্তব পরিকল্পনা পেশ করবে। তবে একথা স্বীকার করতে আমার মনে বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই যে, এর কি ফল হবে সে সম্বন্ধে আমি মোটেই আগ্রহান্বিত নই। ছাত্রসমাজ বা আমাদের জনসাধারণ কি করে, আমি তাই দেখতে উৎসুক। শুধু কাগজ-কলমের দৌড়ে কখনও স্বায়ত্বশাসন লাভ করা যায় না। যতই বক্তৃতার স্রোত ছুটান যাক না কেন, তার ফলে আমাদের স্বায়ত্বশাসনের যোগ্যতা অর্জিত হয় না। শুধু আমাদের চরিত্রবলই আমাদের এর যোগ্যতা দেবে। (হর্ষধ্বনি) ভবিষ্যতে কি ভাবে আমরা দেশ শাসন করব? আজ আমি আপনাদের সঙ্গে এক সাথে হৃদয় মন্থন করতে মনস্থ করেছি। বক্তৃতা দেওয়া আজ আমার উদ্দেশ্য নয় এবং আজ সন্ধ্যায় আপনাদের যদি মনে হয় যে, আমি কিছু রেখে ঢেকে বলছি না, তাহলে আমার অনুরোধ এই যে, আপনারা একে এমন একজন ব্যক্তির মনোরাজ্যের অর্গল মুখে ধরা বলে ভাববেন যে কিনা আজ সবার সাথে একত্র বসে হৃদয় মন্থন করতে চায়। আপনাদের যদি মনে হয় যে এ পথে চলতে গিয়ে আজ আমি শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করছি, তাহলে আপনারা আমাকে এর জন্য মার্জনা করবেন, এই আমার নিবেদন। কাল সন্ধ্যায় বিশ্বনাথ মন্দির দেখতে গিয়েছিলাম এবং বিশ্বনাথের গলি দিয়ে হাঁটার সময় আমার মনে নিম্নস্বরূপ চিন্তার উদয় হল:—হঠাৎ যদি আকাশ থেকে কোন আগন্তুক এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হয় এবং তাকে যদি আমাদের হিন্দুসমাজ সম্বন্ধে অভিমত জ্ঞাপন করতে হয়, তাহলে তার পক্ষে আমাদের নিন্দা করাটাই কি স্বাভাবিক নয়? এই মহান দেব-দেউল কি আমাদের চরিত্রের প্রতিচ্ছবি নয়? হিন্দু হিসাবেই আমি একথা বলছি। আমাদের এই পবিত্র দেবালয়ের গলিগুলি কি এত নোংরা থাকা উচিত? এর চতুষ্পার্শ্বস্থ গৃহগুলির কোন শ্রী-ছাঁদ নেই। গলিগুলি সর্পিল এবং সংকীর্ণ।

মন্দিরগুলি পর্যন্ত যদি প্রশস্ততা এবং পরিচ্ছন্নতার নিদর্শন না হয়, তবে স্বায়ত্ত-শাসনের ফলে আর কি হবে ? যাবতীয় লটবহরসহ ইংরেজরা স্বেচ্ছায় বা চাপে পড়ে, যেমন ভাবেই হোক ভারতভূমি ছেড়ে গেলেই কি আমাদের মন্দিরগুলি পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও শান্তির আকর হবে ?

কংগ্রেসের সভাপতির সঙ্গে এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ সহমত যে, স্বায়ত্ত-শাসনের কথা ভাবার আগে এর জন্য আমাদের যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে। প্রত্যেক নগর দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি সেনানিবাস অঞ্চল এবং অপরটি আসল শহর। এই শহর নামক অংশটি এক পূতিগন্ধময় নরকস্বরূপ। জাতি হিসাবে আমরা নাগরিক জীবনে অনভ্যস্ত। শহরে থাকতে হলে নিরুদ্বিগ্ন গ্রাম্যজীবনের অনুকরণ করলে চলবে না। উপর থেকে নিষ্ঠীবন পড়ার আশঙ্কা নিয়ে যে বোম্বাইএর ভারতীয় অধ্যুষিত অঞ্চলের পথচারীদের চলাফেরা করতে হয়, এ চিন্তা করতেও আমার অস্বস্তি বোধ হয়। আমি যথেষ্ট রেলভ্রমণ করে থাকি। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের অসুবিধাসমূহ আমি লক্ষ্য করে দেখি। তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য শুধু রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের উপর দোষারোপ করলেই চলবে না। পরিচ্ছন্নতার প্রাথমিক নিয়ম-গুলিও আমরা জানি না। গাড়ীর মেঝেতে যেখানে সেখানে আমরা থুথু ফেলি এবং কখনও চিন্তা করি না যে, সময় সময় ঐ মেঝের উপর শোওয়া হয়। মেঝেতে কি করছি তা আমরা ভাবি না এবং তার ফলস্বরূপ কামরাটি অবর্ণনীয় আবর্জনা স্তূপে ভরে ওঠে। তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর যাত্রীবর্গ তাঁদের অপেক্ষাকৃত কম সৌভাগ্য-শালী ভ্রাতৃবৃন্দকে এড়িয়ে চলেন। এদের ভিতর আমাদের ছাত্র সমাজকেও আমি দেখেছি। সময় সময় তাঁরাও এর চেয়ে শ্রেয় আচরণের নিদর্শন দেখাতে পারেন না। তাঁরা ইংরাজী বলে এবং নরফোক্ জ্যাকেট গায়ে দেন বলে তাঁদের জোর করে গাড়ীতে ওঠার অধিকার আছে এবং বসার জায়গা পাবার দাবী আছে বলে তারা মনে করেন। সর্বত্র আমি সন্ধানী আলো নিক্ষেপ করেছি এবং আপনারা আজ আপনাদের সামনে আমার মনের কথা ব্যক্ত করার সুযোগ দিয়েছেন বলে আমি আমার হৃদয় আপনাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করছি। আমাদের স্বায়ত্ত-শাসনাভিমুখী অগ্রগতির পথে নিঃসন্দেহে এসব দোষ সংশোধন করতে হবে।

এবার অপর একটি দৃশ্যের প্রতি আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। গতকাল আমাদের বিতর্ক সভায় সভাপতিত্ব করার কালে মহামান্য কাশীর নরেশ মহোদয় ভারতের দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু যে বিরাট সামিয়ানার নিচে বসে মহামান্য বড়লাট বাহাদুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করলেন, সে সম্বন্ধে আমাদের কি বক্তব্য আছে ? নিঃসন্দেহেই সেখানে এক মহা আড়ম্বর-

-পূর্ণ অনুষ্ঠান নিষ্পন্ন হয়। মণিমানিক্য ও জড়োয়ার যে প্রদর্শনী হল তাতে প্যারিসের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিবান রত্ন-বণিকেরও চোখে ধাঁধা লেগে যাবে। এইসব বহুমূল্য বসনভূষণে আবরিত সম্রান্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ দরিদ্রের তুলনা করে ধনীক সমাজকে আমার বলতে ইচ্ছা করে, "আপনারা এইসব হীরা জহরৎ নিজ অঙ্গ থেকে খুলে ফেলে আপনাদের স্বদেশীয় ভারতবাসীদের জন্য অছিরূপে এসব ধনরত্নের রক্ষণাবেক্ষণ না করলে ভারতের মুক্তি নেই।" (শুনুন, শুনুন ও হর্ষধ্বনি) আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের মহামান্য সম্রাট বা লর্ড হার্ডিঞ্জ কেউই নিশ্চয় চান না যে, সম্রাটের প্রতি অকৃত্রিম আনুগত্য প্রকাশের জন্য আমাদের রত্নালঙ্কারের পেটিকা -শূন্য করে আপাদমস্তক ভূষণ শোভিত হয়ে উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন। যদি বলেন তবে আমার জীবন সংশয় করেও আমি স্বয়ং সম্রাট পঞ্চম জর্জের কাছ থেকে এই মর্মে এক নির্দেশ আনাতে পারি। ব্রিটিশ ভারত বা আমাদের মহান রাজন্যবর্গ শাসিত অঞ্চল, যেখানেই কোন বিরাট সৌধ নির্মিত হচ্ছে বলে আমি শুনি, আমি অবিলম্বে ঈর্ষিত হয়ে উঠি এবং মনে মনে, বলি, "ও, এ অর্থ তো কৃষককুলের কাছ থেকে এসেছে।" দেশের শতকরা পঁচাত্তর জনেরও বেশী কৃষিজীবি এবং গত রাত্রে মিঃ হিগিনবুথাম তাঁর সুললিত ভাষায় আমাদের জানিয়েছেন যে, এরাই একটি দানার বিনিময়ে শস্যের দুটি শীষ সৃষ্টি করে। এদের পরিশ্রমের প্রায় সমস্তটাই যদি আমরা নিয়ে নিই বা অপরকে নিতে দিই, তাহলে আমাদের ভিতর স্বায়াত্বশাসনের ভাবধারা বিদ্যমান বলে বলা চলবে না। আমাদের মুক্তি আসবে এই কৃষককুলের ভিতর দিয়ে। আইনজীবি, চিকিৎসক বা ধনী জমিদারদের দ্বারা মুক্তির আবাহন হবে না।

সর্বশেষে উল্লেখ করলেও একটি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এবার আলোচনা করা আমার কর্তব্য বলে বোধ করছি। গত দুই তিন দিন যাবৎ এ বিষয়টি আমাদের সকলের হৃদয়কেই আলোড়িত করেছে। বড়লাট যখন কাশীর রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন তখন আমরা অনেকেই সশঙ্কচিত্তে ছিলাম। বহু জায়গায় গোয়েন্দার ঘাঁটি ছিল। আমাদের মনে আতঙ্ক ছিল। মনে আমাদের প্রশ্ন জাগছিল, "এই অবিশ্বাস কেন? এইভাবে জীবন্মৃত অবস্থায় দিনাতিপাত করার চেয়ে লর্ড হার্ডিঞ্জের কি মৃত্যুবরণ করা অধিকতর কাম্য নয়?" তবে এক মহান রাজাধিরাজের প্রতিনিধির হয়ত মৃত্যুবরণে ইচ্ছা নেই। তিনি হয়ত জীবন্মৃত অবস্থায় থাকাই প্রয়োজন বোধ করেন। কিন্তু আমাদের ঘাড়ে এইসব গোয়েন্দা চাপিয়ে দেবার অর্থ কি? আমরা এর জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করতে পারি, এর জন্য বিচলিত হতে পারি বা হয়তো এর প্রতিবাদ করতে পারি; কিন্তু আমাদের ভুলে

গেলে চলবে না যে বর্তমান ভারত অশান্তচিত্ততা বশতঃ একদল রাজদ্রোহীর জন্ম দিয়েছে। নিজে আমি একজন রাজদ্রোহী; তবে তা অন্যরকমের! কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন একশ্রেণীর রাজদ্রোহী আছেন, যাঁদের কাছে আমার কথা পৌঁছালে আমি বলতাম যে, ভারতকে যদি বিজেতাকে জয় করতে হয়, তবে ভারতে তাঁদের রাজদ্রোহের পদ্ধতির কোন স্থান নেই! ও পন্থা ভয়ের নিদর্শন। আমরা যদি ঈশ্বরে বিশ্বাসী হই ও তাঁকে ভয় করি, তাহলে রাজা মহারাজা, বড়লাট বা এমন কি সম্রাট পঞ্চম জর্জ আদি কাউকে আর ভয় করার প্রয়োজন থাকে না। দেশাত্মবোধের জন্য রাজদ্রোহীদের আমি সম্মান কবি, মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গে প্রস্তুত বলে তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি; কিন্তু তাঁদের আমার জিজ্ঞাস্য এই—"হত্যাকরা কি সম্মানজনক কার্য? গৌরবজনক মৃত্যু বরণ করার পূর্বে কি নিজ হস্তকে রক্তপিয়াসী ছুরিকায় শোভিত করা খুবই বাঞ্ছনীয়?" আমি একথা মানি না। কোন শাস্ত্রে এর স্বপক্ষে কিছু কথিত হয়নি। আমার যদি মনে হয় যে ভারতের মঙ্গলের জন্য ইংরেজদের এদেশ ত্যাগ কবা উচিত এবং তাদের বিতাড়িত করা প্রয়োজন, তবে দ্বিধাহীনচিত্তে আমি ঘোষণা কবব যে, তাদের যেতে হবে এবং আমার মনে হয়, প্রয়োজন হলে সে বিশ্বাসেব মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাকে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আমার মতে তাকে সম্মানজনক মৃত্যু আখ্যা দেওয়া চলবে। বোমা নিক্ষেপকারী গোপনে ষড়যন্ত্র রচনা করে এবং তারা আত্মপ্রকাশে ভীত। তারা ধরা পড়লে ভ্রান্তপথে পরিচালিত উদ্যমের মূল্য পরিশোধ করে শোকাবহভাবে। অনেকে আমাকে বলেন, "এ যদি না আমরা কবতাম এবং কিছু লোক যদি বোমা না ছুঁড়ত, তবে বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনে আমদের জয় হ'ত না।" (শ্রীমতী বেসান্ত, "দয়া করে এ প্রসঙ্গ বন্ধ করুন")। বাঙলা দেশে মিঃ লিয়নের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভাতেও আমি ঠিক এই কথাই বলেছিলাম। আমার মনে হয় আমার বক্তব্য বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে। অবশ্য আমাকে যদি বক্তৃতা বন্ধ করতে বলা হয় আমি সে নির্দেশ মান্য করব। (সভাপতির দিকে ফিরে) আমি আপনার নির্দেশ প্রত্যাশী। আপনি যদি মনে করেন, যে ভাবে এবং যে বিষয়ে আমি বলছি তাতে দেশ ও সাম্রাজ্যের কোন উপকার হবার নয়, তাহলে আমার বক্তৃতার পরিসমাপ্তি ঘটাব। (চীৎকার: বলুন, বলুন) (সভাপতি আপনার মনোভাব বুঝিয়ে বলুন) আমার উদ্দেশ্য আমি ব্যাখ্যা করছি। আমি শুধু (পুনর্বার বাধাপ্রাপ্তি)। বন্ধুগণ! এ বাধার জন্য ক্ষুব্ধ হবেন না। এখন যদি শ্রীমতী বেসান্ত আমাকে বক্তৃতা বন্ধ করতে বলেন, তাহলে বুঝতে হবে যে, তিনিও ভারতবর্ষকে গভীর ভাবে ভালবাসেন এবং তিনি মনে করেন যে, এই নবযুবক

সমাবেশে আমার হৃদয় মন্থন করে আমি ভুল করছি। যাই হোক, আমার বক্তব্য এই যে, আমি ভারতবর্ষকে এই দু'তরফা অবিশ্বাসের অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করতে চাই। আমাদের লক্ষ্যে উপনীত হতে হলে আমাদের পারস্পারিক প্রীতি ও বিশ্বাসের বনিয়াদের উপর রচিত এক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে হবে। নিজ নিজ গৃহে দায়িত্বহীনভাবে কোন কথা বলার চেয়ে এই কলেজের ছত্রছায়ায় এ বিষয়ে আলোচনা করা কি শ্রেয় নয়? এসব কথার খোলাখুলি ভাবে চর্চা করা আমি অনেক ভাল বলে মনে করি। ইতিপূর্বে এ পদ্ধতিতে আমি চমৎকার ফললাভ করেছি। আমি জানি যে এমন কোন বিষয় নেই যা কিনা ছাত্ররা আলোচনা করে না। এমন কোন বিষয় নেই ছাত্ররা যা জানে না। সেই কারণে আমি সন্ধানী আলোর রশ্মি নিজেদের দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি। মাতৃভুমির সুযশ আমার কাছে এত প্রিয় বলেই আমি আজ আপনাদের সঙ্গে এভাবে ভাব বিনিময় করলাম এবং আমি আপনাদের বলব যে ভারতে সন্ত্রাসবাদের স্থান নেই। শাসকদের আমরা যা বলতে চাই, তা আমরা স্পষ্ট ও প্রকাশ্যভাবে বলব এবং তার জন্য তাঁদের বিরাগভাজন হলে তার ফলভোগ করার জন্য প্রস্তুত থাকব। কিন্তু আমরা যেন কাউকে গালাগালি না দিই। কয়েকদিন পূর্বে আমি একজন বহুনিন্দিত সিভিল সার্ভিস বিভাগের ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাঁদের সঙ্গে আমি কদাচিৎ একাত্মতা বোধ করি; তথনি আমার সঙ্গে তাঁর আলোচনার পদ্ধতির প্রশংসা না করে আমি থাকতে পারছি না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা মিঃ গান্ধী, আপনি কি মনে করেন যে সিভিল সার্ভিসের আমরা প্রত্যেকেই খারাপ এবং যাদের আমরা শাসন করতে এসেছি, তাদের উপর অত্যাচার করাই আমাদের লক্ষ্য?" আমি বললাম, "না।" তিনি তখন বললেন, "তাহলে আপনি সময় ও সুযোগ মত কখনও এই বহুনিন্দিত সিভিল সার্ভিস বিভাগ সম্বন্ধে অন্ততঃ একটি প্রশংসা সূচক বাক্য উচ্চারণ করবেন।" আজ আমি সেই প্রশংসার কথাটি বলতে চাই। একথা সত্য যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের অনেকে নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর পীড়ক ও অত্যাচারী। সময় সময় তাঁদের মধ্যে বিচার-বুদ্ধির লেশমাত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। তাঁদের সম্বন্ধে আরও বহুবিধ বিশেষণ প্রয়োগ করা যেতে পারে। এসব আমি স্বীকার করি এবং একথাও আমি মানি যে কয়েক বৎসর ভারতে থাকার পর তাঁদের মধ্যে অনেকের অধঃপতন ঘটে। কিন্তু এর দ্বারা কি সুচিত হয়? এখানে আসার আগে তাঁরা ভদ্র ছিলেন এবং সেই নৈতিকতার কিয়দংশ যদি লোপ পেয়ে থাকে, তবে তা আমাদের দোষে হয়েছে। (না-না ধ্বনি) নিজেরাই ভেবে দেখুন না কেন। একজন লোক যদি কাল পর্যন্ত ভাল ছিল এবং আজ আমার সঙ্গে

মেশার পর খারাপ হয়, তাহলে কার দোষ—তার না আমার? ভারতে পদার্পণ করা মাত্র যে তোষামোদ, চাটুকারিতা এবং মিথ্যার পরিবেশ তাঁদের পরিবেষ্টন করে, এ দোষ তার এবং সেই পরিবেশের প্রভাবে আমাদের মধ্যে অনেকেই উৎসন্নে যেতে পারি। সময় সময় নিজের কাঁধে দোষ নেওয়া ভাল। স্বায়ত্তশাসন অর্জন করতে হলে এ দায়িত্ব আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। স্বায়ত্তশাসন কোনদিনই, কেউ আমাদের হাতে তুলে দেবে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য এবং ব্রিটিশ জাতির ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। তারা স্বাধীনতা প্রিয় হলেও যে জাত নিজেরা স্বাধীনতা না অর্জন করবে, তাদের তাবা স্বাধীনতা দেবে না। আগ্রহ থাকলে বুয়র যুদ্ধ থেকে আপনারা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন। মাত্র কয়েক বৎসর পূর্বে যারা সে সাম্রাজ্যের শত্রু ছিল আজ তারা মিত্রে পরিণত হয়েছে।

(এই অবস্থায় আবার বক্তৃতায় বাধা পড়ল এবং মঞ্চোপরি উপবিষ্ট ব্যক্তিরা উঠে দাঁড়ানোতে এখানেই বক্তৃতার আকস্মিক বিরতি হল।)

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সংযোজন (১)

বেনারসের ঘটনা †

নিউ ইণ্ডিয়া এবং অপর কয়েকস্থলে শ্রীমতী য়্যানি বেসান্ত বেনারসেব ব্যাপাবের যে আলোচনা করেছেন ; তার জন্য একেবারে ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও আমাব কাছে সে প্রসঙ্গে প্রত্যাবর্তন করা প্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হচ্ছে। রাজন্যবর্গের সঙ্গে তিনি যে নিম্নকণ্ঠে অলোচনা করেছিলেন, আমার বক্তব্য শ্রীমতী য়্যানি বেসান্ত অধিকার করেছেন। আমি শুধু এইটুকুই বলব যে নিজের চক্ষু কর্ণকে যদি আমার বিশ্বাস কবতে হয়, তবে আমার বক্তব্যে আমি অবিচল থাকব। অনুষ্ঠানেব সভাপতি দ্বারভাঙ্গার মহারাজের উভয়দিকে অর্ধ-বৃত্তাকারে আমন্ত্রিতবর্গ বসেছিলেন এবং শ্রীমতী বেসান্ত ছিলেন বামদিকের অর্ধবৃত্তেব ভিতর। একজন তো বটেই, সম্ভবত দু'জন দেশীয় নবেশ তাঁর পাশে ছিলেন। আমার বক্তৃতার সময় তিনি প্রায় আমার পিছনে পড়ে যান। মহারাজ যখন উঠেন, তখন তিনিও উঠে দাঁড়ান। রাজন্যবর্গ মঞ্চ ছেড়ে চলে যাবার আগেই আমি বক্তৃতা বন্ধ করি। বিনম্রভাবে আমি তাঁকে জানাই যে তিনি আমার বক্তৃতায় বাধা না দিলেই

*নটেশন কোম্পানী কর্তৃক প্রকাশিত "স্পীচেস্ এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী" পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ হইতে।

†কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে তাঁর বক্তৃতায় কিভাবে বাধা পড়ে সে সম্বন্ধে গান্ধীজী কর্তৃক প্রদত্ত সংবাদপত্রের বিবৃতি।

পারতেন। তবে আমার বক্তব্য তাঁর মনঃপূত না হলে বক্তৃতার শেষে তিনি যে এর সঙ্গে সহমত নন, একথা জানিয়ে দিতে পারতেন। তিনি কিন্তু খানিকটা উত্তেজিতভাবে জবাব দিলেন, "আপনি মঞ্চোপরি উপবিষ্ট আমাদের সকলকে এক অস্বস্তিকর ও অবাঞ্ছনীয় অবস্থায় ফেলার পরও কি আমাদের পক্ষে বসে থাকা সম্ভব? আপনার ওসব কথা বলার দরকার ছিল না।" বেনারসের ঘটনা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন যে আমার জন্য উদ্বেগ বোধ করাতেই তিনি শুধু আমার বক্তৃতায় বাধা দিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু উপরিউক্ত ঘটনাতে তো তার প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমি বলব যে তিনি যদি শুধু আমার নিরাপত্তা কামনা করতেন, তবে আমাকে একটি চিরকুটে লিখে বা কানে কানে একথা জানিয়ে সাবধান করে দিতে পারতেন। আর তা ছাড়া আমাকে রক্ষা করার জন্য এসব করে থাকলে তাঁর রাজন্যবর্গের সঙ্গে উঠে দাঁড়ানোর এবং তাঁদের সাথে বক্তৃতা গৃহ ছেড়ে চলে যাবারই বা কি প্রয়োজন ছিল?

আমি এখনও জানি না যে আমার বক্তৃতায় এমন কি ছিল, যার জন্য তাঁর কাছে সে বক্তৃতা এমন আপত্তিজনক মনে হল এবং তাঁর পক্ষে বক্তৃতায় বাধা দেওয়া প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। বড়লাটের পরিদর্শনের কালে তাঁর নিরাপত্তা ব্যবস্থার কথা আলোচনা করার পর আমি এই কথা প্রমাণ করার প্রয়াস পাচ্ছিলাম যে, হত্যাকারীর মৃত্যু মোটেই গৌরবের নয় এবং বলেছিলাম যে, সন্ত্রাসবাদ আমাদের শাস্ত্রগ্রন্থবিরোধী ও ভারতে এর স্থান নেই! এরপর আমি এই কথা বলেছিলাম যে, গৌরবজনক মৃত্যুর কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে; কারণ সেইসব ব্যক্তি নিজ আদর্শের জন্য মরণ বরণ করেছে। কিন্তু গোপনে বহুবিধ ষড়যন্ত্র করার পর একজন বোমা নিক্ষেপকারী যখন মারা যায়, তখন সে কি পায়? এরপর আমি এই ভ্রান্ত ধারণা নিরসনে অগ্রসর হই যে, বোমা নিক্ষেপকারীর প্রচেষ্টা ছাড়া বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আমরা সফল হতাম না। এই অবস্থাতে শ্রীমতী বেসান্ত আমার বক্তৃতা বন্ধ করার জন্য সভাপতির কাছে আবেদন করেন। ব্যক্তিগতভাবে আমি আমার এ বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করা কাম্য বলে মনে করি। কারণ তার ধারা থেকেই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবে যে, আমার বক্তৃতায় ছাত্রদের হিংসাত্মক কার্যকলাপে উদ্বুদ্ধ করার মত কিছুই ছিল না। বস্তুতঃ কঠোর আত্ম-সমীক্ষার আগ্রহদ্বারা চালিত হয়েই আমি বক্তৃতা দিয়েছিলাম।

সেদিনের বক্তৃতা আমি এই বলে সুরু করেছিলাম যে, আমার ইংরাজীতে বক্তৃতা দেওয়া শ্রোতৃমণ্ডলী এবং আমার নিজের পক্ষেও লজ্জার কথা। আমি বলেছিলাম যে, শিক্ষার মাধ্যম ইংরাজী হওয়ার ফলে দেশের ভীষণ ক্ষতি হয়েছে।

আমার মনে হয়, আমি একথা প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছিলাম যে বিগত পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ উচ্চতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষা আমাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে পেলে আমরা এতদিনে প্রায় আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছে যেতাম। অতঃপর আমি এবারের কংগ্রেস অধিবেশনে যে স্বায়ত্বশাসনের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তার কথা উল্লেখ করে মন্তব্য করি যে, অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি বা অখিল ভারত মুসলীম লীগ যখন ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের খসড়া রচনা করবে তখন আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজ আচরণ দ্বারা নিজেদের স্বায়ত্বশাসনের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। আমাদের লক্ষ্যের কতদূরে আমরা আছি তার নিদর্শন পেশ করার জন্য আমি কাশী বিশ্বনাথের পবিত্র মন্দিরের নিকটস্থ সর্পিল গলিগুলির অপরিচ্ছন্নতা এবং সম্প্রতি যেসব প্রাসাদোপম অট্টালিকা পথের ঋজুতা বিস্তারের কথা চিন্তা না করেই যেন-তেন-প্রকারেন নির্মিত হয়েছে, তার প্রতি শ্রোতৃমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। তদনন্তর আমি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে যে মণ্ডপ রচিত হয়েছিল, তার আড়ম্বরের প্রতি সভাজনদের মনযোগ আকর্ষণ করে বলেছিলাম যে, আমাদের ধনীক সম্প্রদায় যেভাবে রত্নালঙ্কারে ভূষিত হয়ে এসেছেন, তাতে এদেশ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ একজন আগন্তুক এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করার পর এই ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে ফিরে যাবেন যে ভারত বিশ্বের অন্যতম সম্পাদশালী দেশ। এরপর রাজা মহারাজদের লক্ষ্য করে কথঞ্চিৎ রসিকতা সহকারে আমি তাঁদের এই পরামর্শ দিই যে, আমরা লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা যেন তাঁদের রত্নালঙ্কারসমূহ জাতির অছিরূপে রক্ষণাবেক্ষণ করেন এবং আমি এর সমর্থনে জাপানী রাজবংশীয়-দের উদাহরণ পেশ করি। তাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে বংশপরম্পরা প্রাপ্ত ভূসম্পত্তি এবং ধনরত্ন বিলিয়ে দেওয়া গৌরবের কাজ বলে মনে করেন। অতঃপর আমি আমাদের মাননীয় অতিথি বড়লাট বাহাদুরকে আমাদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য যে নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়েছে, সেই অবমাননাকর দৃশ্যের প্রতি শ্রোতৃমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তারপর আমি এই কথাই সপ্রমাণ করবার চেষ্টা করছিলাম যে, এইসব নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থার জন্য আমরাই দায়ী; কারণ ভারতে সুসংগঠিতভাবে যে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড চলছে, তার জন্যই এই নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। এইভাবে একদিকে আমি দেখাচ্ছিলাম যে কেমন ভাবে ছাত্র সম্প্রদায় সামাজিক কদাচার দূর করার কাজে সক্রিয়ভাবে আত্মনিয়োগ করতে পারে এবং অন্যদিকে এমনকি তাদের চিন্তা জগতেও যেন হিংস-পদ্ধতি বিজয়ী না হয়, তার চেষ্টা করছিলাম।

গত বিশ বৎসর যাবৎ আমি জনসেবার ক্ষেত্রে আছি এবং এর মধ্যে আমাকে

অসংখ্যবার উত্তেজিত জনতার মাঝে বক্তৃতা দিতে হয়েছে। এই অভিজ্ঞতার আধারে আমি দাবী করছি যে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোভাব বোঝার মত কিছুটা ক্ষমতা আমার আছে। আমার বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া আমি সতর্কভাবে লক্ষ্য করছিলাম এবং স্পষ্ট দেখেছি যে আমার বক্তৃতায় ছাত্রদের মাঝে বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি হয়নি। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে অনেকে পরদিবস আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানায় যে, তারা আমার দৃষ্টিকোণ যথাযথভাবে উপলব্ধি করেছে এবং আমার কথা তাদের মনে দাগ কেটেছে। তাদের ভিতর একজন কূটতার্কিক ছিল এবং সে আমাকে নানারকম প্রশ্ন করার পর এই ধারায় আরও কিছু আলোচনা শুনে আমার মতে বিশ্বাসী হয়। এযাবৎ দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংলণ্ড এবং ভারতে আমি বহুসংখ্যক স্বদেশীয় ছাত্রের সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে সেদিনের সন্ধ্যার যুক্তিতর্ক পেশ করে দেখেছি যে, তাদের মধ্যে অনেকে সন্ত্রাসবাদের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করেছে।

সর্বশেষে আমি বোম্বাইএর শ্রী এস. ডি. সেটলারের কথা বলব। ইনি সেদিনকার ঘটনার বিবরণ "হিন্দু" পত্রিকাতে লিখেছেন। তাঁকে মোটেই আমার বন্ধুভাবাপন্ন আখ্যা দেওয়া চলে না। ববং ক্ষেত্রবিশেষে তিনি সম্পূর্ণ অসঙ্গতভাবে আমাকে "তুলো-ধোনা" করার চেষ্টা করেছেন। তিনি স্বয়ং সমস্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখা সত্ত্বেও তাঁর বক্তব্য শ্রীমতী বেসান্তের থেকে ভিন্ন। তাঁর মতে লোকের মনে এই ধারণা সৃষ্ট হয় যে, আমি সন্ত্রাসবাদীদের মোটেই প্রোৎসাহন দিই নি ; বরং আমলাতান্ত্রিক সিভিলিয়ানদের সাফাই গাওয়ার চেষ্টা করেছি। আমার প্রতি শ্রীযুক্ত সেটলারের যাবতীয় আক্রমণ এই কথাটিই প্রমাণ করে যে, হিংসাকে প্রোৎসাহন দেবার মত কোন অপরাধ আমি করিনি ; বরং রত্নালঙ্কারাদির কথা তোলাই আমার দোষ হয়েছিল।

আমার এবং শ্রীমতী বেসান্ত, উভয়ের প্রতিই ন্যায় বিচার করার উদ্দেশ্যে আমি নিম্নলিখিত পরামর্শ দেব। তিনি বলেছেন যে, আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি ঠিক কোন্ বাক্যটির জন্য রাজন্যবর্গ উঠে দাঁড়ান, তা বলবেন না। কারণ তাতে তিনি শত্রুপক্ষের ফাঁদে পড়ে যাবেন। তাঁর পূর্ব বিবৃতি অনুযায়ী আমার বক্তৃতার অনুলিপি ইতিপূর্বে গোয়েন্দাদের হাতে চলে গেছে এবং তাই আমার নিরাপত্তার দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁর মৌনতার আর বিন্দুমাত্র মূল্য নেই। অতএব তাঁর কাছে যদি আমার বক্তৃতার যথাযথ অনুলিপি থাকে, তাই অথবা আমার যে কথার ফলে তাঁর আমাকে বাধা দেওয়া এবং রাজন্যবর্গের সভাস্থল ছেড়ে চলে যাওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়লো, অন্ততঃ তার সারমর্ম প্রকাশ করা কি শ্রেয়স্কর নয় ?

সুতরাং আমি এই বিবৃতি শেষ করার সময় আমার পূর্ব কথনের পুনরাবৃত্তি করে

বলব : শ্রীমতী বেসান্তের কাছ থেকে বাধা না পেলে আর কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করতাম এবং তাহলে সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধে আমার মনোভাব নিয়ে কোন ভ্রান্তধারণার উদ্রেক হতো না।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতার সংযোজন (২)

বেনারসের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ †

মহাত্মাজীর পরবর্তী জীবনে বেনারসের ঘটনা যথেষ্ট প্রভাব রেখে যায় বলে এই অবকাশে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। বেনারসে বক্তৃতা দেওয়ার কালে গান্ধীজী কয়েকবার শ্রীমতী বেসান্তের নিকট থেকে বাধাপ্রাপ্ত হন। ইনি গান্ধীজীর পূর্বে তাঁর বক্তৃতা শেষ করে মঞ্চোপরি উপবিষ্টা ছিলেন। গান্ধীজী তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু যথাযথভাবে বলার আগেই বক্তৃতার মাঝখান থেকে কয়েকটি কথা ও ধুয়ো শুনে ভ্রান্তধারণাপরবশ হয়ে শ্রীমতী বেসান্ত এইভাবে তাঁর বক্তৃতায় বাধা দেন। শ্রীমতী বেসান্তের মান ও মর্যাদা গান্ধীজীর চেয়ে বেশীই বলা যায়; অথচ তিনি সভাপতির অনুমতি ব্যতিরেকে গান্ধীজীকে বক্তৃতা থামাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। তিনি এমন কি উঠে দাঁড়িয়ে সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলী এবং বিশেষতঃ হিন্দু সেণ্ট্রাল কলেজের উপস্থিত ছাত্রবৃন্দকে সাবধান করে দেন যে, তারা যেন বক্তার কথায় কান না দেন এবং তাঁর উপদেশ গ্রহণ না করেন; কারণ তাঁর মতে বক্তা তাঁদের ভুল পথে পরিচালিত করছেন। এই হিন্দু সেণ্ট্রাল কলেজের ছাত্ররাই হচ্ছে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণস্বরূপ এবং এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাত্রী হওয়ায় ছাত্রদের তিনি মাতৃস্বরূপা। গান্ধীজী কিছুক্ষণ নীরব রইলেন; কিন্তু শ্রোতৃমণ্ডলী তাঁর বক্তব্য শোনার আগ্রহ প্রকাশ করল। তিনি এরপর শ্রীমতী বেসান্তের সদিচ্ছার প্রশংসা করলেন এবং যথোচিত বিনয় সহকারে অনুষ্ঠানের সভাপতি দ্বারভাঙ্গার মহারাজের দিকে ফিরে যুক্ত করে জানতে চাইলেন যে তিনি তাঁর কথা বলবেন না থেমে যাবেন? ইতোমধ্যে সভামঞ্চোপরি উপবিষ্ট সকলে নিম্নস্বরে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন এবং দেশীয় নৃপতিবর্গ ও ইংরেজ রাজকর্মচারীগণ শ্রীমতী বেসান্তসহ একযোগে সভাস্থল ত্যাগ করলেন। সভাপতি মহোদয় অবশ্য গভীর অভিনিবেশ সহকারে গান্ধীজীর বক্তৃতা শ্রবণ করছিলেন এবং তিনি এর মধ্যে আপত্তিকর কোন কিছু বা অন্যায় খুঁজে পান নি। সেই কারণে

* "স্পিচেস এণ্ড রাইটিংস অফ মহাত্মা গান্ধী" পুস্তকের প্রথম সংস্করণ হইতে। নটেশন্ কোম্পানী।

† শ্রী উপেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত "গান্ধী মাহাত্ম্য" হইতে

তিনি গান্ধীজীকে বলার অনুমতি দিয়ে জানালেন যে, তিনি যেন মাঝপথে বক্তৃতা বন্ধ না করেন। অতএব এরপর গান্ধীজী প্রায় সাড়ে ন'টা পর্যন্ত বলে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এই গ্রন্থের সম্পাদক সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং একটি পত্রিকায় সভার বিবরণ পাঠাবার জন্য সাংবাদিকের জন্য নির্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীমতী বেসান্ত তাঁকে গুরুতররূপে অবমাননা করার চেষ্টা করা সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধী তাঁর প্রতি যে রকম মধুর আচবণ করেন, তাতে আমি চমৎকৃত হই। শ্রোতৃমণ্ডলী শ্রীমতী বেসান্তের আচরণ মোটেই সমর্থন করেনি। তাবা ববং এর তীব্র প্রতিবাদ করে এবং তাঁর এই অনাহুত বাধাদানেব জন্য তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের দাবী তারা জ্ঞাপন করে। সত্যিকথা বলতে গেলে মহাত্মা গান্ধীই আন্তরিক ও গভীর ভাব-ব্যঞ্জনামূলক শব্দসম্ভার প্রয়োগে সেই মাননীয়া বৃদ্ধা মহিলার পক্ষ সমর্থন করে সেদিন শ্রীমতী বেসান্তকে বক্ষা করেন। তিনি বলেন, তাঁব বিশ্বাস আছে যে, শ্রীমতী বেসান্ত তাঁরই মতো ছাত্রদের হিতাকাঙ্ক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে অমন করেছেন। এই গ্রন্থের সম্পাদক তার জীবনে এই প্রথমবার প্রত্যক্ষ করল যে ঐরূপ গভীব অন্যায় অভিযোগের সামনেও মানুষ কিভাবে এরকম অবিচল থাকতে পারে। বস্তুতঃ ঐ ঘটনার পর থেকেই আমাব মনে মহামানব গান্ধীজীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে সম্যক উপলব্ধি হয়। সে সভা থেকে আমি এই শিক্ষা নিয়ে ফিরলাম যে, চেষ্টা করলে মানুষ নিজেকে কত উঁচুতে ওঠাতে পাবে। ঐরূপ এক সংকটজনক মুহূর্তে সভার কার্য পরিচালনা করার জন্য সভাপতি মহোদয় যে রকম দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্য তিনিও যথেষ্ট প্রশংসার্হ।

৫। আর্থিক বনাম নৈতিক প্রগতি *

আর্থিক উন্নতির সঙ্গে কি আসল উন্নতির সংঘাত বাধে? আমি ধরে নিচ্ছি যে আর্থিক প্রগতির অর্থ হচ্ছে অপরিমিত আধিভৌতিক উন্নতি এবং আসল উন্নতির অর্থ হচ্ছে আমাদের শাশ্বত বৃত্তিগুলির ক্রমোন্নতি। বিষয়টিকে তাই এইভাবে বলা যেতে পারে যে, নৈতিক প্রগতি কি আধিভৌতিক প্রগতির সঙ্গে সমান তালে চলতে পারে না? আমি অবশ্য জানি যে আমাদের বর্তমান সমস্যার তুলনায় এ

* এলাহাবাদের মুইর সেণ্ট্রাল কলেজের ইকনমিক সোসাইটিতে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২২শে ডিসেম্বর গান্ধীজী প্রদত্ত বক্তৃতা।

বিষয়টি ব্যাপকতর। তবে সাহস করে আমি একথা বলতে পারি যে ক্ষুদ্রতর কিছুর ভিত্তিস্থাপনাকালে আমাদের দৃষ্টিপথে বৃহত্তর একটা কিছুই বিরাজিত থাকে। কারণ বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে আমরা জানি যে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শাশ্বত শান্তি বা বিরাম বলে কিছুই নেই। তাই আধিভৌতিক প্রগতি এবং নৈতিক উন্নতির সঙ্গে যদিও সংঘাত না বাধে, তবু নৈতিক উন্নতিব তুলনায় আবিভৌতিক উন্নতিরই অধিক উৎকর্ষ সাধিত হবে। বৃহত্তব বিষয়বস্তুর পক্ষ সমর্থনে অক্ষম কেউ কেউ যেমন এলোমেলো ভাবে সময় সময় নিজেদেব কথা পেশ কবেন, তেমন ভাবে আমবা সন্তুষ্টি লাভ কবতে পারি না। পরলোকগত স্যার উইলিযম উইলসন হাণ্টাব বর্ণিত অর্ধাশনে জীবনযাপনকাবী ত্রিশকোটী ভাবতবাসীর প্রত্যক্ষ উদাহবণ দেখে তাঁবা বোধ হয় বিচলিত হয়ে পড়েন। তাঁদেব বক্তব্য হচ্ছে এই যে এদেব নৈতিক উন্নতির কথা চিন্তা কবা বা বলাব আগে, এদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে হবে। তাঁবা বলেন যে এই জন্য নৈতিক উন্নতির বদলে আধিভৌতিক প্রগতির উপর জোব দেওয়া হয়। আর তারপবই একটা মস্ত লাফ মাবা হয় ও বলা হয় যে ত্রিশকোটীর বেলায় যে কথা খাটে, সারা বিশ্বের বেলায়ও সে কথা খাটবে। তাঁবা ভুলে যান যে মামলা ঘোরালো হলে আইনও জটিল হয়। এই অনুমান যে কতখানি অবাস্তব তা বলা আমাব পক্ষে বাহুল্য মাত্র। অসহনীয় দারিদ্র্যের চাপে নৈতিক অবনতি ছাড়া যে অন্য কিছু আব আসতে পাবে না, এমন কথা কেউ কখনও বলেনি। প্রত্যেক মানুষেরই বাঁচাব অধিকার আছে, আব তাই নিজেব অন্নবস্ত্র এবং বাসস্থানের জোগাড় কবারও তাব অধিকাব আছে। তবে এই সামান্য কাজটুকুর জন্য অর্থ-নীতিবিদ বা তাদেব আইনকানুনেব সাহায্য নেবার প্রয়োজন নেই।

দুনিয়াব যাবতীয় ধর্মগ্রন্থেই এই উপদেশ প্রতিধ্বনিত হয়েছে যে "আমামীকালের জন্য ভাবনা কোবো না"। জীবিকা অর্জন কবা, যে কোন সুসংগঠিত সমাজে পৃথিবীর সবচেয়ে সহজ কাজ মনে হয় বা হওয়াই বিধেয়। বস্তুত কোটীপতিদের সংখ্যা দ্বাবা নয়, জনসাধারণের মধ্যে অনশনের অপ্রতুলতা দ্বারা একটি দেশেব সুসংবদ্ধতা নিরূপিত হয়। এখন বিচার্য বিষয় হচ্ছে এই যে, আধিভৌতিক প্রগতির অর্থ হচ্ছে নৈতিক উন্নতি—এই কথাটি বিশ্বজনীন নীতি হিসাবে গ্রহণযোগ্য কিনা।

কয়েকটি উদাহরণ নিয়ে দেখা যাক। ইহজাগতিক বিভবে রোম যখন অতীব সমৃদ্ধিশালী, তখনই তার নৈতিক অধঃপতন ঘটল। মিশর এবং বোধ হয় যে সমস্ত দেশের ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়, তাদের বেশীর ভাগেরই অনুরূপ অবস্থা হয়। শ্রীকৃষ্ণের বংশধর এবং আত্মীয়রা যখন ধনকুবের তখনই তাঁদের পতন হয়। রকফেলার বা কার্নেগী ইত্যাদির নৈতিকতা যে সাধারণ পর্যায়ের ছিল, এ কথা

আমরা অস্বীকার করি না, তবে সানন্দে আমরা তাঁদের একটু শিথিল ভাবেই বিচার করে থাকি। আমার একথার অর্থ হচ্ছে এই যে তাঁদের কাছে পরিপূর্ণ নৈতিক নিরিখ আমরা আশা করতে পারি না। তাঁদের কাছে আধিভৌতিক উন্নতির অর্থ সবসময় নৈতিক উন্নতি নয়। দক্ষিণ আফ্রিকায়, যেখানে খুব ঘনিষ্ঠভাবে আমার সহস্র সহস্র স্বদেশবাসীর সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম, আমি লক্ষ্য করেছি যে যেখানে যত প্রাচুর্য সেখানে তত নৈতিক ভ্রষ্টাচার। বেশী কথা কি, আমাদের ধনিকবর্গ দরিদ্রদের মত নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধরূপ নৈতিক সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার জন্য এগিয়ে আসেন নি। ধনীদের আত্মসম্মানে গরীবদের মত অত আঘাত লাগে নি। বিপদের আশঙ্কা না থাকলে আমাদের আশেপাশের লোকদের মধ্যে থেকে আমি দেখাতে পারতাম যে কেমন ভাবে ধনসম্পদ থাকায় সত্যকার উন্নতির ব্যাঘাত হয়। সাহস করে আমি একথা বলতে পারি যে অর্থনীতির নিয়মকানুনের ব্যপারে এ বিষয়ে অনেক আধুনিক পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে দুনিয়ার ধর্মগ্রন্থসমূহ অধিকতর নিরাপদ এবং প্রামাণ্য। আজ যে প্রশ্ন আমরা নিজেদের করছি, তা মোটেই নতুন নয়। দুই সহস্র বৎসর পূর্বে একথা যীশুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। সেণ্ট মার্ক দৃশ্যটির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। গম্ভীর হয়ে যীশু উপবিষ্ট। চোখে তাঁর স্থির সঙ্কল্পের ছবি। পরকাল সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করছেন। চতুর্দিকের বিশ্ব সম্বন্ধে তিনি সচেতন। সে সময়কার শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ্ তিনি। সময় ও দূরত্বের মিতব্যয়িতায় তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন এবং তিনি উঠেছিলেন এ সবের উর্ধ্বে। এই অনুকূল পরিস্থিতিতে একজন তাঁর কাছে দৌড়ে এসে নতজানু হয়ে বসে পড়ল এবং জিজ্ঞাসা করল, "দয়ালু প্রভু, কি করলে আমি শাশ্বত স্বর্গ পেতে পারি ?" যীশু তাকে বলছেন, "আমাকে দয়ালু বলছ কেন তুমি ? সেই এক ঈশ্বর ছাড়া দয়ালু আর কেউ নেই। তাঁর আজ্ঞা তুমি জান। অধর্মাচার কোরো না। জীবহত্যা কোরো না, চুরি কোরো না, এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দিও না। কাউকে প্রতারিত কোরো না এবং নিজের মাতাপিতাকে সম্মান দিও।" এর জবাবে লোকটি তাঁকে বলল, "প্রভু, আমার যৌবনকাল থেকেই আমি এসব মেনে চলছি।" তখন যীশু তার দিকে সপ্রেম দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, "একটি জিনিসের অপ্রতুলতা তোমার মধ্যে আছে। তুমি ঘরে ফিরে গিয়ে তোমার যা কিছু আছে সব বিক্রী করে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দরিদ্রের দান কর এবং তাহলে স্বর্গে গিয়ে তুমি সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে। ফিরে এসে দুঃখ সহন কর আর আমাকে অনুসরণ কর।" এই কথায় বিষণ্ণ হয়ে লোকটি চলে গেল ; কারণ সে ছিল প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী। চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করে যীশু তাঁর শিষ্যদের লক্ষ্য করে বললেন,

"ঈশ্বরের রাজ্যে ধনীরা কদাচিৎ প্রবেশ করতে পারে।" তাঁর শিষ্যবৃন্দ এ কথায় আশ্চর্যান্বিত হ'ল, কিন্তু যীশু এর জবাব প্রসঙ্গে পুনরায় বললেন, "বৎসগণ, আর্থিক সম্পদের শ্রেষ্ঠতায় যারা আস্থাবান তাদের ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করা কঠিন। ধনীর ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করার চেয়ে উটের পক্ষে বরং সূচের ফুটো দিয়ে গলে যাওয়া সহজ।" ইংরেজী সাহিত্যে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণিত জীবনের শাশ্বত নীতির বর্ণনার এ এক অভিনব দৃষ্টান্ত। আজ আমরা যেমন অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়ি, তাঁর শিষ্যরাও সেইরকম করেছিল। আমাদেরই মত তাঁকে তারা বলেছিল, "কিন্তু দেখুন, বাস্তব জীবনে এ নীতি কেমন অকার্যকরী। আমরা যদি সব বিক্রী করে দিই, আর যদি কিছুই আমাদের না থাকে, তবে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার মতও কিছু আমাদের থাকবে না। অর্থ না থাকলে আমরা পরিমিত পরিমাণেও ধর্মচারী হতে পারি না।" সুতরাং ব্যাপারটা দাঁড়াল এইরকম : "খুব আশ্চর্যান্বিত হয়ে তারা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করতে লাগল : 'তা'হলে প্রাণ পেতে পারে কে ?' তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করে যীশু বললেন, "মানুষের পক্ষে এ অসম্ভব ; কিন্তু ভগবানের কাছে নয়। কারণ তাঁর পক্ষে সবই সম্ভব।" তারপর পিটার তাঁকে বলতে লাগলেন : "দেখুন, আমরা সর্বস্ব ত্যাগ করে আপনার অনুসরণ করছি।" উত্তরে যীশু বললেন : "প্রকৃতই আমি তোমাদের বলছি যে এমন কেউ নেই যে আমার জন্য বা ধর্মের খাতিরে স্ত্রী, পুত্র, পরিজন, পিতা, মাতা, ভগ্নী বা জমিজমা এবং ঘর ইত্যাদি পরিত্যাগ করেছে। পরলোকে তারা শাশ্বত সুখ পাবে বা এখানকার চেয়ে শতগুণে গৃহ, আত্মীয়, ভগ্নী, পিতা, মাতা, সন্তান-সন্ততি এবং জমিজমার সুখ ভোগ করতে পারবে এই আকাঙ্ক্ষায় তারা এসেছে। আজ যারা সবচেয়ে আগে আছে তারা হয়ত পিছনে পড়ে যাবে, আর যারা একেবারে পিছনে পড়ে আছে তারাই হয়তো থাকবে সর্বাগ্রে।" এ বিধান অনুসরণ করার ফল বা পুরস্কার (কথাটি যদি আপনাদের মনোমত বোধ হয়) হচ্ছে এই। অন্যান্য অহিন্দু ধর্মগ্রন্থ থেকে অনুরূপ অংশ উদ্ধৃত করার প্রয়োজনীয়তা আমি বোধ করি না। যীশু বর্ণিত নীতির সমর্থনে আমাদের নিজেদের মুনি-ঋষিদের লেখা বাণী উদ্ধৃত করে, বা এমন কি বাইবেলের যে অংশটির প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, তার চেয়েও কড়া তাঁদের কোন বাণী বা লেখা উদ্ধৃত করে, আমি আপনাদের অপমানিত করতে চাই না। আমাদের সামনে যে প্রশ্ন এসে দাঁড়িয়েছে সে বিষয়ে জগতের মহান উপদেশকবৃন্দের জীবনই বোধহয় এই নীতি সমর্থনকারী সবচেয়ে প্রামাণ্য সাক্ষ্য। যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, নানক, কবির, চৈতন্য, শঙ্কর, দয়ানন্দ, রামকৃষ্ণ ইত্যাদির সহস্র সহস্র লোকের উপর অতুলনীয় প্রভাব ছিল এবং তাঁরা তাদের চরিত্র গঠন করেছিলেন। তাঁরা এ পৃথিবীতে এসে-

ছিলেন বলে জগৎ ধন্য। আর স্বেচ্ছায় তাঁরা সবাই দারিদ্র্যকে বরণ করে নিয়েছিলেন।

আধুনিক বস্তুতান্ত্রিক উন্মত্ততাকে যতই আমরা আমাদের আদর্শ বলে মনে করছি, অবনতির পথে ততটাই আমরা নেমে যাচ্ছি—এই যদি আমার স্থির বিশ্বাস না হ'ত, তবে যে বিষয়টিকে বোঝানোর জন্য আমি এত চেষ্টা করছি, তা করতাম না। আমার ধারণা এই যে, যে ধরণের অর্থনৈতিক উন্নতির কথা আমি বলেছি, তা সত্যকার উন্নতির পরিপন্থী। তাই পুরাকালের আদর্শ ছিল সম্পদ বৃদ্ধির প্রচেষ্টাকে সংযত করা। এর ফলে যাবতীয় আধিভৌতিক কামনা বাসনার পরিসমাপ্তি হয়ে যায় না। বরাবরের মত আমাদের মধ্যে এমন অনেকে থাকবেন, ধনার্জনের প্রচেষ্টাকেই যাঁরা জীবনের লক্ষ্য করে তুলবেন। কিন্তু চিরকালই আমরা দেখে আসছি যে এতে আদর্শচ্যুতি হয়। একটি মজার ব্যাপার এই যে আমাদের মধ্যে প্রভূত বিত্তশালীরাও সময় সময় মনে করেন যে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্যকে বরণ করে নিলে তাঁরা ভাল করতেন। কেউ যে একই সঙ্গে ঈশ্বর এবং কুবেরের সেবা করতে পারে না, এ এক মূল্যবান অর্থনৈতিক তথ্য। আমাদের পথ বেছে নিতে হবে। বস্তুতান্ত্রিকতা-দানবের পদতলে পড়ে পাশ্চাত্য জাতিসমূহ আজ আর্তনাদ করছে। তাদের নৈতিক উন্নতি বন্ধ হয়ে গেছে। টাকা, আনা, পয়সা দিয়ে তারা তাদের উন্নতির পরিমাপ করে, আমেরিকার সম্পদ তাদের মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকা অন্যান্য দেশের হিংসার পাত্র হয়ে উঠছে। আমার বহু স্বদেশবাসীকে আমি বলতে শুনেছি যে আমরা আমেরিকার মত সম্পদ অর্জন করব বটে, তবে তাদের সম্পদ অর্জনের পন্থাকে বর্জন করব। আমার মতে এরকম প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। একই সঙ্গে আমরা "জ্ঞানী, শান্ত এবং ক্রোধোন্মত্ত" হতে পারি না। নৈতিক বলে দুনিয়ায় সর্বশ্রেষ্ঠ হতে নেতৃবৃন্দ আমাদের শিক্ষা দিন—এই আমি চাই। কথিত আছে যে এক সময় আমাদের দেশ ঈশ্বরের বাসস্থান ছিল। যে দেশ কলকারখানার বিকট আওয়াজে এবং চিম্‌নির ধোঁয়ায় ভরে গেছে এবং যে দেশের রাস্তাগুলিতে চলাচলে বাধা সৃষ্টিকারী এমন সব দ্রুতগতি যান্ত্রিক শকট চলে, যার অন্যমনস্ক যাত্রীসমূহ জানে না যে তারা কি চায়, এবং পাথরের মত বাক্স-বন্দি করলে বা একেবারে অপরিচিত আগন্তুকদের মধ্যে পড়লেও যাদের মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় না এবং যে দেশের যাত্রী এবং আগন্তুকবর্গ সম্ভব হলে পরস্পর পরস্পরকে স্থানচ্যুত করতে উদ্‌গ্রীব, সে দেশে ঈশ্বরের কথা ধারণাও করা যায় না। আধিভৌতিক প্রগতির প্রতীক বলেই এসবের আমি উল্লেখ করলাম। কিন্তু এতে এক কণাও সুখ আসে না। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক ওয়ালেস

নিম্নলিখিত ভাষায় তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

"অতীতের যে সমস্ত প্রাচীনতম তথ্যরাজি আমরা পেয়েছি, তাতে এই কথার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় যে নৈতিকতা সম্বন্ধে তৎকালীন সাধারণ ধারণা ও চিন্তাধারা, নৈতিকতার মান এবং এর ফলে উদ্ভূত আচার-ব্যবহার, এখনকার চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিল না।"

আর্থিক সমৃদ্ধির ফলে ইংরেজ জাতি যে অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে, এর পরে কয়েকটি অধ্যায়ে তিনি তা বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন: "সম্পদের এইরূপ অভাবনীয় সমৃদ্ধি হওয়ায় ও প্রকৃতিকে জয় করার ক্ষমতা বেড়ে যাওয়ার ফলে, আমাদের নতুন সভ্যতা ও অগভীর খৃষ্টীয় ধর্মবিশ্বাসের উপর মারাত্মক চাপ পড়েছে। এর ফলে বহুবিধ সামাজিক ব্যভিচার অভূতপূর্ব বিস্ময়কর গতিতে আমাদের মধ্যে এসে পড়েছে।" কেমনভাবে নরনারী এবং শিশুর মৃতদেহের উপর কলকারখানা সমূহ গড়ে উঠেছে এবং কেমনভাবে দেশের অর্থসম্পদের সমৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক অবনতি ঘটেছে, এ তিনি এর পরে দেখিয়েছেন। অপরিচ্ছন্নতা, আয়ুক্ষয়-কারী বৃত্তি, ভেজাল দেওয়া, ঘুষ নেওয়া, জুয়া খেলা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা করে তিনি একথা প্রমাণ করেছেন। আর্থিক সমৃদ্ধির ফলে ন্যায় কিভাবে পদদলিত হচ্ছে, পানাসক্তি এবং আত্মহত্যার ফলে মৃত্যুহার কেমনভাবে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, কেমনভাবে অপরিণত অবস্থায় জন্মহারের পর ও জন্মদোষসম্পন্ন শিশুর সংখ্যা বাড়ছে এবং বেশ্যাবৃত্তি একটি বিধিসম্মত প্রথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এসবই তিনি দেখিয়েছেন। নিম্ন-লিখিত অর্থব্যঞ্জক মন্তব্য সহকারে তিনি তাঁর বিশ্লেষণের পরিসমাপ্তি করেছেন: "সম্পদ এবং অবকাশের পরিণামের অপব দিকটি যে কি, তা জানা যায় বিবাহ বিচ্ছেদের আদালতের কার্যবিবরণী থেকে। এ ছাড়া আমার একটি বন্ধু, লণ্ডনের বিলাসী সমাজে যাঁর যথেষ্ট যাতায়াত আছে, আমাকে বলেছিলেন যে, লণ্ডন এবং মফঃস্বলে সময় সময় এমন সব বহু প্রকারের নৈশকালীন প্রমোদের ব্যবস্থা দেখা যায় যে, চরমতম ইন্দ্রিয়পরায়ণ সম্রাটদের রাজত্বকালীন ব্যবস্থাসমূহকেও সেগুলি ছাড়িয়ে যায়। যুদ্ধ সম্বন্ধেও আমার বলার কিছুই নেই। রোমান সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থানের পর থেকে কম বেশী এ অবস্থা চলেই আসছে, তবে বর্তমানে যাবতীয় সভ্যজাতির ভিতর নিঃসন্দেহেই যুদ্ধবিমুখতা দেখা দিয়েছে। কিন্তু যখন অস্ত্রশস্ত্রের বিরাট বোঝা এবং শান্তির স্বপক্ষের সদিচ্ছাপ্রণোদিত ঘোষণাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, তখন এই কথাই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, আদর্শ হিসাবে শাসক সম্প্রদায়ের ভিতর নৈতিকতার লেশমাত্র নেই।"

ইংরেজদের আওতায় আমরা অনেক কিছু শিখেছি, তবে আমার দৃঢ়

বিশ্বাস এই যে যথার্থ নৈতিকতার ব্যাপারে ব্রিটেনের কাছ থেকে আমাদের শেখার মত বিশেষ কিছু নেই। বস্তুতান্ত্রিকতার ব্যারামের ফলে ব্রিটেন যে সমস্ত পাপাচারের আকর হয়ে উঠেছে সতর্ক না হলে আমরা সে সমস্তই আমাদের দেশে আমদানি করব। আমাদের সভ্যতা এবং নৈতিকতাকে আমরা যদি বজায় রাখি, অর্থাৎ গৌরবোজ্জ্বল অতীত নিয়ে গর্ব না করে, আমাদের নিজেদের জীবনে সেই প্রাচীন নৈতিক গৌরবকে ফুটিয়ে তুলি, তবেই আমরা ইংলণ্ড এবং ভারত উভয়েরই উপকার করব। শাসনকর্তা যোগাড় করে দেয় বলে যদি আমরা ইংলণ্ডের অনুসরণ করি, তবে তারা এবং আমরা উভয়েই অপমান ভোগ করব। আদর্শের সম্বন্ধে বা সে আদর্শকে চূড়ান্তরূপে বাস্তবে পরিণত করা সম্বন্ধে আমাদের শঙ্কিত হবার প্রয়োজন নেই। খাঁটি আধ্যাত্মিক জাতি আমরা তখনই হব, যখন স্বর্ণের চেয়ে সত্য অধিক পরিমাণে আমাদের দেশে দৃষ্ট হবে, ক্ষমতা এবং সম্পদের জাঁকজমকের চেয়ে নির্ভীকতা বেশী হবে, এবং নিজের স্বার্থের চেয়ে বদান্যতার স্থান ঊর্ধ্বে হবে। আমাদের গৃহ, প্রসাদ, এবং মন্দিরগুলিকে আমরা বিভবের আওতা থেকে মুক্ত করে সেগুলিতে নৈতিকতার নৈসর্গিক ধর্মের প্রবর্তন করতে পারলে ব্যয়বহুল এক সেনাদলের ভার না বহন করেও আমরা যে কোন বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে পারব। আমরা প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্য এবং তাঁর পবিত্রতার অন্বেষণ সুরু করলে দেখব যে তারপর সব কিছুই নিঃসন্দেহে পেয়ে যাব। এই হচ্ছে খাঁটি অর্থনীতি। আমরা সবাই যেন এ সঞ্চয় করতে পারি এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনে একে প্রয়োগ করতে পারি।

৬। সত্যাগ্রহাশ্রম *

গত বৎসর যে সব ছাত্র আমার সঙ্গে এখানে আলোচনা করতে আসে, তাদের আমি বলেছিলাম যে ভারতের কোন এক জায়গায় আমি আশ্রম জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করতে চলেছি এবং আজ তোমাদের কাছে আমি সেখানকার কথাই বলব। শুধু এখনই নয়, আমার লোকসেবার জীবনে সদাসর্বদাই আমি এই কথাটি অনুভব করেছি যে চরিত্রগঠনই আমাদের কাছে বর্তমানে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। অবশ্য পৃথিবীর সকল জাতিরই এর প্রয়োজন আছে, তবে

*১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ফেব্রুয়ারী মাদ্রাজের ওয়াই. এম. সি. এতে প্রদত্ত বক্তৃতা।

আমাদের চেয়ে বেশী প্রয়োজন বোধহয় আর কারও নেই। গোখলের মত মহান দেশপ্রেমিকেরও এই অভিমত, (হর্ষধ্বনি) তোমরা জান, গোখলে বহুবার বলেছেন যে আমাদের আকাঙ্ক্ষার অনুরূপ চরিত্রবল না থাকলে কোন দিনই আমরা কিছু পাব না এবং পাওয়ার যোগ্যতাও অর্জন করব না। এই কারণেই তিনি সার্ভেন্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির পত্তন করেন। তোমরা দেখে থাকবে যে এই প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুনে গোখলে জেনে শুনেই লিখেছেন যে আমাদের দেশের রাজনৈতিক জীবনে নৈতিকতার সঞ্চার করা প্রয়োজন। তোমরা এও শুনেছ যে তিনি প্রায়ই বলতেন যে, আমাদের দেশের গড়পড়তা চরিত্রবল ইউরোপের অনেক দেশের গড়ের চেয়ে কম। যাঁকে আমি আমার রাজনৈতিক গুরু মনে করি, তাঁর ঐ মন্তব্য সত্য-সত্যই যথার্থ কিনা এবিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। তবে আমি একথা স্বীকার করব যে, ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায় সম্বন্ধে ওকথা বহুল পরিমাণে সত্য। আমাদের মত শিক্ষিতবর্গ বহুবিধ ভুল করেছি বলেই আমি শুধু একথা বলছি না। আসলে আমরা সব অবস্থার দাস। যাই হোক, জীবন সম্বন্ধে আমি এই নীতি বাক্যটি গ্রহণ করেছি যে, সমাজের যত উচ্চস্তরেই অধিষ্ঠিত হোক না কেন, যে কোন ব্যক্তির যে কোন রকমের কাজের কোন মূল্যই থাকবে না, যদি নাকি তা ধর্মীয় ভাবনা-যুক্ত না হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে ধর্ম কি? এ প্রশ্ন লোকে অবিলম্বে জিজ্ঞাসা করবে। আমি এর জবাবে বলব : ধর্ম অর্থে বিশ্বের যাবতীয় শাস্ত্ররাজি-মন্থিত জ্ঞান নয়; সত্যিকথা বলতে কি এর সঙ্গে মস্তিষ্কের অনুভূতির কোন সম্বন্ধ নেই, এ হচ্ছে হৃদয়ের ব্যাপার। এ জিনিস বাইরে থেকে আমাদের উপর চাপিয়ে দেবার নয়, আমাদের ভিতর থেকেই এর বিকাশ করতে হ'বে। ধর্ম সদা সর্বদা আমাদের ভিতরে রয়েছে। কেউ এ সম্বন্ধে সচেতন, আবার কেউ বা অচেতন। কিন্তু এ জিনিস আমাদের ভিতর আছেই এবং তাই আমরা যদি উচিত পন্থায় স্থায়ী কিছু করতে চাই, তাহলে বাইরের সহায়তা বা অন্তরের বিকাশ, যে পথেই হোক, আমাদের ভিতরস্থ এই ধর্মীয় ভাবনাকে জাগ্রত করতে হবে।

আমাদের ধর্মশাস্ত্রে কতকগুলি নিয়মকে জীবনের নীতি ও স্বতঃসিদ্ধ সত্য আখ্যা দেওয়া হয়েছে। স্বতঃপ্রকাশ সত্য বলে এগুলিকে আমাদের মেনে নিতে হবে। শাস্ত্রে বলে যে এইসব নীতি অনুযায়ী না চললে ধর্ম সম্বন্ধে কোনরূপ অনুভূতি হওয়াই অসম্ভব। এই সুদীর্ঘকাল অবধি এই সমস্ত নীতিকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এসে এবং শাস্ত্রের এইসব নির্দেশকে নিজ আচরণে প্রয়োগ করার প্রযত্ন করার পর আজ আমার এই ধারণা হয়েছে যে, আমার সঙ্গে সমভাবে চিন্তাকারী ব্যক্তিদের সহ-যোগিতা পাবার জন্ম এবার এজাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করা প্রয়োজন। এই

আশ্রমের অধিবাসী হতে হলে যেসব নিয়মকানুন মানতে হবে বলে স্থির হয়েছে, এবার আমি সেগুলি তোমাদের জানাব।

এর মধ্যে পাঁচটিকে যাম আখ্যা দেওয়া হয় ও তার মধ্যে প্রথম ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে :

সত্য

এ সত্য বলতে সত্যের সাধাবণ সংজ্ঞা অর্থাৎ যথাসম্ভব মিথ্যার আশ্রয় না নেওয়া বোঝায় না। "সততাই সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি" বলতে যা বুঝায় (অর্থাৎ সততা যদি সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি না হয় তবে এর থেকে বিচ্যুত হওয়া চলতে পারে) এ সত্যের তাৎপর্য তাও নয়। আমাদের ক্ষেত্রে সত্যের ধারণা হচ্ছে এই যে, জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপকে যে কোন মূল্যে সত্যনীতি দ্বারা চালনা করতে হবে। সত্যের এই ব্যাখ্যার আদর্শ উদাহরণ হচ্ছে ভক্ত প্রহ্লাদের জীবন। সত্যের মর্যাদা রক্ষার্থ সে পিতার বিরুদ্ধাচরণ করার দুঃসাহস প্রকাশ করেছিল এবং কোন প্রতিশোধাত্মক কার্যকলাপ দ্বারা বা পিতৃদেব অনুসৃত পীড়ন পদ্ধতির অনুকরণ করে সে তাঁর দুষ্কৃতির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার প্রয়াস পায় নি। পিতা ও তাঁর অনুচরবর্গের কাছ থেকে প্রহ্লাদ যে আঘাত পেয়েছিল, তা ফিরিয়ে দেবার কথাকে মনে স্থান পর্যন্ত না দিয়ে প্রহ্লাদ সত্যের জন্য সজ্ঞানে মৃত্যুবরণ করতে উদ্যত হয়েছিল। শুধু তাই নয়, আঘাতের তীব্রতা হ্রাস করার জন্যও প্রহ্লাদ কোন প্রযত্ন করে নি। এর পরিবর্তে সস্মিত বদনে সে একের পর এক কঠোর অত্যাচার সহ্য করে গেছে এবং এর ফলে অবশেষে সত্যের জয় হয়েছে। তবে প্রহ্লাদের মনে এ ভাবনা ছিল না যে এ পীড়ন সহ্য করার ফলে তার জীবদ্দশাতেই কোন না কোন দিন সে সত্যপথের অভ্রান্ততা প্রমাণে সমর্থ হবে। কার্যত এমন ঘটলেও ঘটনাচক্রে প্রহ্লাদ যদি মাঝপথে মারাও যেত, তবু সে সত্যকেই আঁকড়ে থাকত। আমি চাই যে এই ধরণের সত্য অনুসরণ করা হোক। কালকের একটি ঘটনার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। ঘটনাটা অবশ্য খুবই অকিঞ্চিৎকর ; তবু এর দ্বারা বোঝা যায় যে, হাওয়া কোনদিকে বইছে। ব্যাপারটা হচ্ছে এই :—জনৈক বন্ধু একান্তে আমার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলতে চান এবং সেইজন্য গোপনে আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলছিলাম। সেখানে হঠাৎ আর একটি বন্ধু উপস্থিত হলেন এবং বিনীতভাবে জানতে চাইলেন যে তাঁর উপস্থিতি আমাদের বার্তালাপে বাধা সৃষ্টি করছে কিনা। যাঁর সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম, তিনি উত্তর দিলেন, "আরে না-না, এখানে গোপন বলে কিছু নেই।" আমি কিঞ্চিৎ বিস্ময় বোধ করলাম ; কারণ আমাকে একান্তে ডেকে নিয়ে যাওয়ায় আমি

বুঝতে পেরেছিলাম যে, অন্তত আগন্তুক দ্বিতীয় বন্ধুটির ক্ষেত্রে এ আলোচনা গোপনীয় ছিল। তিনি কিন্তু অবিলম্বে বিনয়ের খাতিরে (আমার মতে এটা অতি বিনয়) জবাব দিলেন যে কোন গোপন আলোচনা হচ্ছে না এবং দ্বিতীয় বন্ধুটি এতে যোগদান করতে পারেন। আমি আপনাদের জানাতে চাই যে আমি সত্যের যে সংজ্ঞা দিয়েছি এটা তার বহির্ভূত। আমার মতে বন্ধুটির উচিত ছিল অত্যন্ত ভদ্র অথচ স্পষ্ট ও খোলাখুলিভাবে তাঁকে বলা, "হ্যাঁ, এই সময়টুকুর জন্যে আপনার কথা ঠিক। আমাদের কথাবার্তায় একটু বাধাই পড়ছে।" সে বন্ধুটি ভদ্রভাবাপন্ন হলে তাঁকে বিন্দুমাত্র আহত না করে একথা বলা চলে এবং যতক্ষণ না স্বয়ং কেউ প্রমাণ করছেন যে তিনি ভদ্র নন, ততক্ষণ আমরা তো প্রত্যেককে ভদ্রলোক বলে ধরে নেব। কিন্তু অনেকে হয়তো বলবেন যে উপরিউক্ত ঘটনায় আমাদের জাতির সজ্জনতার নিদর্শন পাওয়া যায়। আমার মনে হয় যে এর দ্বারা আমার বক্তব্য বেশী করে প্রমাণিত হয়েছে। আমরা বিনয়বশতঃ যদি এ ধরণের কথাবার্তা বলা সুরু করি, তবে আমরা প্রতারকের জাতে পরিণত হব। জনৈক ইংরেজ বন্ধুর সঙ্গে আমার একবার যে আলোচনা হয়েছিল তার কথা মনে পড়ছে। তাঁর সঙ্গে আমার তেমন পরিচয় ছিল না। তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ এদেশে আছেন এবং একটি কলেজের অধ্যক্ষতার কাজ করেন। আমরা দু'জনে একটি লেখা মিলিয়ে নিচ্ছিলাম। ইংরেজদের মত আমরা মনেপ্রাণে কোন কিছু না চাইলেও সাহস করে "না" বলতে পারি না—এ কথা আমি জানি কিনা তিনি আমার কাছে জানতে চাইলেন। আমি আপনাদের কাছে স্বীকার করছি যে তৎক্ষণাৎ আমি এর জবাবে "হ্যাঁ" বললাম। তাঁর বক্তব্য সমর্থন করলাম। যার সঙ্গে আমরা কথা বলি তাঁর বক্তব্যকে যথোচিত মর্যাদা দেবার জন্য আমরা খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে "না" বলতে ইতস্ততঃ বোধ করি। এই আশ্রমে আমাদের নিয়ম হচ্ছে—ফলাফল যাই হোক না কেন, মন না চাইলে আমাদের "না" বলতেই হবে। এইটি হচ্ছে প্রথম নিয়ম।

এরপরে আসছে—

অহিংসা

শব্দগত অর্থে অহিংসার অর্থ জীবহত্যা না করা। আমার কাছে কিন্তু এর অর্থ গভীর ও ব্যাপক। অহিংসা অর্থে শুধু জীবহত্যা থেকে বিরত থাকা বুঝালে আমার মন যেখানে উঠত, অহিংসার মৎকৃত ব্যাখ্যায় আমার আত্মা নিঃসন্দেহে তার চেয়ে অনেক ঊর্ধ্বলোকে সঞ্চরণ করে। অহিংসার যথার্থ অর্থ হচ্ছে কাউকে দুঃখিত না করা। এমন কি যে তোমাকে তার শত্রু মনে করবে, তার সম্বন্ধেও মনে কোন

রকম বিদ্বেষভাব পোষণ করা চলবে না। আমার অনুরোধ তোমরা এই চিন্তাধারার সতর্ক বিন্যাস পদ্ধতি লক্ষ্য কর। "যাকে তুমি তোমার শত্রু মনে কর"—এমন কথা আমি বলিনি। আমি বলেছি "যে তোমাকে তার শত্রু মনে করে।" কারণ যে অহিংসার পথে চলে, তার কোন বৈরী থাকার উপায় নেই। অরাতির অস্তিত্ব সে অস্বীকার করে। কিন্তু এমন অনেকে থাকতে পারে যারা নিজেদের তার শত্রু মনে করে এবং সে ব্যাপারে তার আর কি হাত আছে? এইজন্য আমি বলছি যে ঐ জাতীয় লোকের প্রতিও তার মনে যেন বিদ্বেষভাব স্থান না পায়। আঘাত ফিরিয়ে দিলে আমরা অহিংসনীতি বিচ্যুত হই। আমি কিন্তু আরও একটু এগিয়ে গেছি। আমরা যদি আমাদের কোন বন্ধু বা তথাকথিত শত্রুর কোন আচরণেব বিরোধিতা করি তাহ'লে এই আদর্শের প্রতিপালন হ'ল না মনে করব। তবে একটি কথা স্মরণ রাখতে হবে। বিরোধিতা না করতে বলার সময় আমি কিন্তু সে কাজে সহযোগিতা করার কথা বলি না। আমার কাছে বিরোধিতার অর্থ হচ্ছে তার অকল্যাণ কামনা করা বা এই অভিলাষ পোষণ করা যে আমাদের নিজেদের প্রচেষ্টায় নয়, ঈশ্বরিক শক্তি জাতীয় অপর কারও প্রভাবে সেই তথাকথিত শত্রু যেন নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করতে না পারে। আমাদের মনে যদি এই জাতীয় ভাবধারা জাগরূক হয়, তবে আমরা পূর্বকথিত অহিংসা নীতি থেকে বিচ্যুত হব। আমাদের আশ্রমে যারা যোগদান করবে, তাদেব অহিংসার এই ব্যাখ্যা বর্ণে বর্ণে মেনে নিতে হবে। অবশ্য এব দ্বারা এই বোঝায় না যে এই নীতিকে আমরা এইভাবে পালন করি। এ তো অনেক দূরের কথা। এই লক্ষ্যে আমরা পৌছাবার ইচ্ছা রাখি এবং এই মুহূর্তেই যদি এই লক্ষ্যেব পানে কুচ্ করার পূর্ণ সামর্থ্য আমাদের থাকত, তবুও অহিংসার এই ব্যাখ্যা আদর্শরূপেই বিরাজিত থাকত। কিন্তু এ তো আর জ্যামিতির প্রতিজ্ঞা নয় যে মুখস্থ করে ফেলা যাবে বা উচ্চাঙ্গের গণিতের কোন সমস্যা নয় যে মাথা ঘামিয়ে তার সমাধান আবিষ্কার করা যাবে। নিঃসন্দেহেই এ বিষয় এসবের চেয়ে অনেক কঠিন। তোমাদের মধ্যে অনেকেই জ্যামিতি বা গণিতের সমস্যাবলির সমাধানের জন্য দীর্ঘরাত্রি বাতির তেল পুড়িয়ে কাটিয়েছ। কিন্তু এ সমস্যার সমাধানের জন্য তোমাদের তেল পোড়ানোর চেয়েও কঠিন কাজ করতে হবে। এ লক্ষ্যে উপনীত হবার বা এর ধারেকাছে পৌছানোর আগে তোমাদের বহু নিদ্রাহীন রাত্রি কাটাতে হবে এবং মানসিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতে নিজে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। ধর্মপথে চলার অর্থ বুঝতে হলে আমাদের এই লক্ষ্যে উপনীত হতে হবে। এর কমে চলবে না। এই নীতি সম্বন্ধে আমি শুধু এইটুকু বলেই ক্ষান্ত হব যে এই নীতিতে আস্থাশীল ব্যক্তি শেষ পর্যন্ত এই লক্ষ্যে উপনীত

হবার প্রাক্কালে দেখবে যে সমগ্র বিশ্ব তার চরণতলে এসে গেছে। সারা জগৎ তার পদতলে পড়ুক—এ ইচ্ছা তার মনে স্থান দেবার দরকার নেই। কিন্তু তবু পরিণাম এব এই হবে। তোমার মনের ভালবাসা অর্থাৎ অহিংসার পরিচয় তুমি যদি এমন ভাবে দিতে পার যে তোমার তথাকথিত শত্রুর মনেও তার স্থায়ী ছাপ পড়ে, তবে নিঃসন্দেহেই সে তার প্রতিদান দেবে। এর থেকে আব একটি কথা ওঠে। এই নীতি মানলে আমাদের জীবনে সংগঠিত হত্যাকাণ্ড বা প্রকাশ্য নরহত্যার কোন স্থান নেই। দেশের জন্য বা তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণাধীন কারও ইজ্জতের জন্যও হিংসার আশ্রয় নেবাব প্রয়োজন নেই। এ পদ্ধতিকে সম্মান বাঁচাবার এক দীন প্রচেষ্টা ছাড়া কি বলা যায়? অহিংসাব এই নীতি আমাদের এই শিক্ষা দেয় যে, আমাদেব বক্ষণাবেক্ষণাধীনদের সম্মান রক্ষার্থ নিজেকে ধর্মনাশে উদ্যত ব্যক্তির হাতে সঁপে দিতে হবে। এর জন্য ঘুসি মাবার চেয়ে অনেক বেশী দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা প্রয়োজন। তোমাদেব হয়তো কথঞ্চিৎ দৈহিক শক্তি (ক্ষমতা নয়) থাকতে পাবে এবং প্রয়োজনকালে তোমরা তার প্রয়োগ করতে পার। কিন্তু এ শক্তি ফুরিয়ে যাবাব পব কি হবে? ক্রোধ ও বিদ্বেষে ফুলে ওঠা তোমার বিপক্ষ তোমার হিংস্র প্রতিরোধের কাবণে আরও অধিকমাত্রায় কুপিত হয়ে উঠবে এবং তোমাকে হত্যা করার পর তার উদ্ধত বোষানল তোমাব আশ্রিতকে দহন করবে। কিন্তু প্রতিরোধ না কবে তুমি যদি শুধু তোমার আশ্রিত এবং বিরুদ্ধপক্ষীয়ের মাঝে অবিচলভাবে দণ্ডায়মান হও এবং প্রত্যাঘাত না কবে শুধু যদি আঘাত সহন কর, তবে তাব কি প্রতিক্রিয়া দেখবে? আমাব দৃঢ বিশ্বাস যে, বিরুদ্ধপক্ষের সমস্ত হিংসা তোমাব উপরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং তোমার আশ্রিতেব গায়ে সে আগুনের আঁচটুকুও লাগবে না। জীবনযাত্রার এই পরিকল্পনায় ইউবোপে আজ দেশাত্ম-বোধের নামে যে যুদ্ধ চলছে, তার স্থান নেই।

এবপর আসে—

ব্রহ্মচর্য ব্রত

জাতির সেবায় আত্মনিয়োগে অভিলাষী বা যথার্থ ধর্মীয় জীবনের আস্বাদ গ্রহণেচ্ছুক প্রতিটি ব্যক্তিকে বিবাহিত বা অবিবাহিত নির্বিশেষে ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে। বিবাহের ফলে দুটি নরনারীব মাঝে নিকটতম সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং তাদের মধ্যে এমন এক বিশেষ ধরণের সখ্যবন্ধন স্থাপিত হয়, যা জন্মজন্মান্তরে কখনও ছিন্ন হবার নয়। আমার কাছে পরিণয় বলতে যা বোঝায় তার মধ্যে লালসার স্থান নেই। যাই হোক না কেন, আশ্রমবাসীদের কাছে বিবাহের এই

ব্যাখ্যাই পেশ করা হয়। এখন এ সম্বন্ধে আর বিশদভাবে আলোচনা করব না।

তারপর হচ্ছে—

আস্বাদ ব্রত

জিহ্বাকে সংযত করলে মানুষ সহজে তার জৈব প্রবৃত্তিকে করায়ত্ত করতে সক্ষম হবে। আমি জানি যে এ ব্রত পালন করা খুবই কষ্টকর। এখনই আমি ভিক্টোরিয়া হোস্টেল পরিদর্শন করে আসছি। সেখানকার একাধিক পাকশালা দেখে আমার অবশ্য ভড়কে যাবার কথা। তবুও আমি ঘাবড়াইনি এইজন্য যে এরকম দেখতে আমি অভ্যস্ত। ভিন্ন ভিন্ন জাতের জন্য এতগুলি পাকশালা চলছে না। বিভিন্ন রকমের রুচির রান্নার জন্য এবং যে যে প্রান্ত থেকে আসছে, সেখানকার রন্ধন প্রণালীসম্মত স্বাদের জন্য এতগুলি পাকগৃহের প্রয়োজন ঘটেছে এবং এইজন্যই আমরা দেখছি যে শুধু ব্রাহ্মণদের জন্যই একাধিক পাকশালা ও তার নানা উপবিভাগ রয়েছে এবং এগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন দলের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পার্থক্যের বিশিষ্ট স্বাদের আহার্য পরিবেশন করা হয়। আমি আপনাদের বলতে চাই যে একে স্বাদের উপর প্রভুত্ব বলে না, বলে জিহ্বার দাসত্ব। আমাদের এই অভ্যাস বর্জন না করলে এবং চা ও কফির দোকান এবং এই জাতীয় পাকশালার উপর থেকে চোখ না ফিরিয়ে নিলে আমাদের নিষ্কৃতির পথ নেই। শরীরকে সুস্থ রাখার পক্ষে পরিমিত আহারে যতক্ষণ না আমরা তুষ্ট হচ্ছি এবং আমাদের খাদ্যে যেসব গরম স্বাদবর্ধক ও উত্তেজক মশলা মেশাই, তা যতদিন না পরিত্যাগ করছি, ততদিন কিছুতেই এই অপ্রয়োজনীয় উত্তেজক বৃত্তির মাত্রাধিক্যের উপর নিয়ন্ত্রণ জারী করতে পারব না। এই পথ না ধরার স্বাভাবিক ফল হবে এই যে, আমরা নিজেদের অধঃপতন ঘটাব এবং আমাদের উপর যে পবিত্র দায়িত্ব ন্যস্ত তা পালন না করে আমরা পশুরও নিম্নপর্যায়ে নেমে যাব। পান, আহার এবং ষড় রিপুর দাস হবার ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পশুর পার্থক্য নেই। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কোন গরু বা ঘোড়াকে কি কখনও আমাদের মত স্বাদেন্দ্রিয়ের দুরুপযোগ করতে দেখেছ? একে কি তোমরা সভ্যতার লক্ষণ বলে মনে কর? সত্যকার জীবনের তাৎপর্য কি নিজ অবস্থার প্রতি দৃকপাত না করে আহার্য তালিকার দৈর্ঘ বৃদ্ধি এবং সম্পূর্ণভাবে উন্মাদ হয়ে সংবাদপত্রে নব নব ভোজ্য তালিকার বিজ্ঞাপনের সন্ধান আরম্ভ না করা পর্যন্ত একের পর এক রকমের খাবার খেয়ে যাওয়া?

এরপর আসে—

অস্তেয় ব্রত

আমার মতে আমরা সকলেই কোন না কোন রকমের চোর। অবিলম্বে প্রয়োজন নেই, এমন কিছু যদি আমি যোগাড় করে রেখে দিই, তাহ'লে তা অপর কারও জিনিস চুরি করার সামিল। দৃঢ়তা সহকারে আমি একথা বলব যে, কোনরূপ ব্যতিক্রম বিনা প্রকৃতির মৌলিক নিয়ম হচ্ছে এই যে, প্রকৃতি আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের পক্ষে পর্যাপ্ত সম্পদ সৃষ্টি করে এবং প্রত্যেকে যদি ঠিক তার যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী না গ্রহণ করে, তবে এ বিশ্বে দারিদ্র্য বলে কিছু থাকবে না এবং অনশনে কেউ আর প্রাণত্যাগ করবে না। বিশ্বে যতদিন এই অসাম্য বিদ্যমান, ততদিন আমরা চুরি করছি বলতে হবে। আমি অবশ্যই বলব যে, যাঁরা এই ঘনঘোর তমিস্রার মাঝে আলোকের অভ্যুদয় দেখতে ইচ্ছুক, ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের এই নীতি মেনে চলতে হবে। আমি কারও উচ্ছেদ কামনা করি না। এরকম করলে আমি অহিংসা নীতি থেকে পতিত হব। আমার চেয়ে কারও যদি বেশী থাকে তবে তা থাকুক। তবে যেখানে আমার নিজ জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন, সেখানে আমি অবশ্যই বলব যে আমার এমন কিছু থাকা উচিত নয়, যা আমার কাছে অপ্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষের প্রায় ত্রিশলক্ষ ব্যক্তিকে একবেলা খেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় এবং সেই একবেলার আহার্য হচ্ছে কোন রকম স্নেহ পদার্থের সম্পর্কবিহীন কয়েকটি শুকনা রুটি ও সামান্য লবণ। এই ত্রিশ লক্ষ ব্যক্তি ভালভাবে খেতে পরতে না পাওয়া পর্যন্ত তোমাদের ও আমাদের আজ যা আছে, তা রাখার অধিকার নেই। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তোমাদের ও আমার বেশী করে জানার কথা বলে ঐসব হতভাগ্যের যথোচিত যত্নের জন্য ও তাদের অন্নবস্ত্র দেবার জন্য আমাদের কর্তব্য হচ্ছে নিজেদের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা ও এমন কি স্বেচ্ছায় উপবাস করা।

এরপর স্বভাবতই অপরিগ্রহের কথা ওঠে এবং তারপর আসে—

স্বদেশী ব্রত

স্বদেশীর ব্রত আমাদের কাছে অপরিহার্য, তবে স্বদেশী জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও স্বদেশী মনোভাব সম্বন্ধে তোমরা ভালভাবেই খবর রাখ। নিজ প্রয়োজনপূর্তির জন্য প্রতিবেশীর বদলে অন্যত্র অপর কারও কাছে গেলে আমরা জীবনের এক পবিত্র নিয়মের বিরুদ্ধাচরণ করছি বলে আমি বলব। মাদ্রাজে তোমাদের ঘরের কাছে যার জন্ম-কর্ম হয়েছে এমন একজন বাসনপত্রের ব্যবসায়ী থাকা সত্ত্বেও বোম্বাই থেকে কেউ এসে যদি তোমাদের কাছে হাঁড়িকুড়ি বিক্রী করতে চায়, তবে তোমাদের তা কেনা উচিত নয়। তোমাদের গ্রামে যতক্ষণ নাপিত রয়েছে, ততক্ষণ মাদ্রাজের ছিমছাম্ চেহারার নাপিতকে পয়সা দেওয়া অনুচিত। তোমরা যদি চাও যে

তোমাদের গ্রামের নাপিত মাদ্রাজের নাপিতের মতই যোগ্যতা অর্জন করুক, তাহলে তোমাদের কর্তব্য হচ্ছে তাকে সেভাবে শিক্ষা দেওয়া। সে যাতে তার পেশা ভাল ভাবে শিখে আসতে পারে, সেজন্য পারলে তাকে মাদ্রাজে পাঠাও। এসব চেষ্টা না করা পর্যন্ত তোমার অন্য নাপিতের কাছে যাবার অধিকার নেই। এই হচ্ছে স্বদেশী। এইভাবে আমরা যখন দেখি ভারতে অনেক জিনিস পাওয়া যায় না, তখন সেগুলি ছাড়াই আমাদের কাজ চালিয়ে নেবার চেষ্টা করা দরকার। এমন অনেক জিনিস ছাড়া আমাদের কাজ চালাতে হবে, যা আজ আমরা প্রয়োজনীয় মনে করি। তবে বিশ্বাস কর, সেরকম মনের অবস্থা এলে "পিলগ্রিমস প্রগ্রেস" বইএর তীর্থযাত্রীদের মত দেখবে যে তোমাদের কাঁধের বোঝার অনেকখানি হাল্কা হয়ে গেছে। তীর্থযাত্রী যে গুরুভার বহন করে চলছিল, একসময় তার অজ্ঞাতসারে কাঁধ থেকে তা পড়ে গেল এবং যাত্রা আরম্ভ করার সময়ের তুলনায় তখন নিজেকে তার অধিকতর মাত্রায় মুক্তপুরুষ বলে মনে হতে লাগল। ঐরকমভাবে এই স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করার পর তোমাদের এখনকার চেয়ে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে হবে।

এরপর—

অভী ব্রত

আমার ভারত পরিভ্রমণকালে আমি দেখেছি যে ভারতবাসী, বিশেষতঃ এদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় মারাত্মক ভয়ের আশঙ্কায় মুহ্যমান। সর্বসাধারণের কাছে আমরা মুখ খুলব না। আমাদের সুচিন্তিত অভিমত সকলের কাছে আমরা ব্যক্ত করব না। নিজেদের মনোভাব মনেই গুপ্ত রেখে বড় বেশী হলে গোপনে তার আলোচনা করব এবং নিজগৃহের চারটি দেওয়ালের ভিতর যথেচ্ছ চলব, অথচ সর্বসাধারণকে এর কিছু জানাব না। আমরা যদি মৌন ব্রত নিতাম, তাহলে বলার কিছু ছিল না। জনসাধারণের কাছে মুখ খুললে আমরা এমন সব কথা বলি, যাতে আমাদের আস্থা নেই। ভারতের প্রায় প্রত্যেকটি জনসেবক, যাদের কখনও বক্তৃতা দিতে হয়, তাঁদের অভিজ্ঞতাও বোধহয় আমারই মত। আমি আপনাদের বলব যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ভয় করার মত একজনই মাত্র আছেন এবং তিনি হচ্ছেন ঈশ্বর। ঈশ্বরকে ভয় করলে যত উচ্চ পদারূঢ় ব্যক্তি হোক না কেন, কাউকে আর আমরা ভয় করব না। সত্য অনুসরণ করার নীতিকে যেভাবে তোমরা পালন করতে চাও না কেন, তার জন্য তোমাদের নির্ভীক হতেই হবে। সেইজন্য ভাগবদ্গীতাতে দেখবে যে নির্ভীকতাকে ব্রাহ্মণের অতীব প্রয়োজনীয় গুণ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। পরিণামের

ভয়ে ভীত হয়ে আমরা সত্য কথা বলা থেকে বিরত থাকি। শুধু যে ভগবানের ভয় রাখে, সে কখনও পার্থিব কোন কিছুতে ভয় পাবে না। ধর্মের স্বরূপ জানার প্রযত্ন করার পূর্বে এবং ভারতের ভাগ্যনিয়ন্ত্রার ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার অভিলাষ পোষণ করার আগে যে নির্ভীকতাকে চরিত্রের অঙ্গস্বরূপ করা প্রয়োজন, একথা কি তোমরা মনে কর না? আমরা নিজেরা যেমন সম্ভ্রম মিশ্রিত আতঙ্কে কালাতিপাত করি, দেশবাসীকে কি তাই শিক্ষা দেব? তাহলে অভীব্রতের গুরুত্ব এবার তোমরা বুঝতে পেরেছ।

এরপর আসে—

অস্পৃশ্যতা পরিহার ব্রত

আজ হিন্দুধর্মের ভিতর এক দুরপনেয় কলঙ্ক বিদ্যমান। আমি মোটেই একথা বিশ্বাস করি না যে যুগ-যুগান্ত থেকে এ প্রথা আমাদের মধ্যে চলে আসছে। সভ্যতার উত্থান-পতনের যে চক্রবৎ অনুবর্তন ধারা চলে, তারই সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরে আমরা যখন পড়ে গিয়েছিলাম, তখনই এই জঘন্য দাসমনোভাবের প্রতীক ছুৎমার্গরূপী প্রথা আমাদের জীবনে দাখিল হয় এবং এই কুপ্রথা আজও আমাদের সমাজ জীবনের অঙ্গরূপে বিরাজিত। আমার মতে এ এক অভিশাপরূপে আমাদের উপর পড়েছে এবং যতদিন পর্যন্ত এই অভিশাপ আমাদের উপর থাকবে, ততদিন এই পবিত্র-ভূমিতে আমাদের যেসব দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে কালাতিপাত করতে হচ্ছে, তাকে আমাদের এই বীভৎস পাপের উপযুক্ত সাজা বলে মনে করতে হবে। পেশার জন্য কাউকে অস্পৃশ্য করার কথা বুঝে ওঠা অসম্ভব। আর তোমাদের মত যেসব ছাত্র আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হচ্ছ, তারা যদি এই পাপকার্যের অংশীদার হও তাহলে তোমরা কোনরকম শিক্ষার আলো না পেলেই ছিল ভাল।

আমাদের অবশ্য যথেষ্ট বাধাবিঘ্নের মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। তোমরা মনে মনে যদি এ কথা মেনেও নাও যে পৃথিবীর কোন মানুষকে অস্পৃশ্য মনে করা উচিত নয়, তবুও নিজ পরিবারের লোকজনের উপর প্রভাব বিস্তার করার সাধ্য তোমাদের নেই এবং তোমাদের চারপাশে যাঁরা আছেন, তাঁদের মত বদলে দেওয়ার ক্ষমতাও তোমাদের নেই। এর কারণ হচ্ছে এই যে, তোমাদের যাবতীয় চিন্তাধারার উৎস হচ্ছে একটি বিদেশী ভাষা এবং সেই ভাষার বেদীমূলে তোমাদের যাবতীয় উদ্যম উৎসর্গীকৃত। এইজন্য আমরা আশ্রমে এই নিয়ম প্রবর্তন করেছি যে আমাদের শিক্ষা হবে—মাতৃভাষার মাধ্যমে

মাতৃভাষার মাধ্যমে

ইউরোপের প্রতিটি শিক্ষিত ব্যক্তি নিজ মাতৃভাষা ছাড়া আরও প্রায় তিন-চারটি ভাষা শিক্ষা করে। ইউরোপের মত আমরাও আমাদের আশ্রমে ভাষা সমস্যার সমাধানের জন্য যতগুলি সম্ভব দেশীয় ভাষা শিক্ষা করি। তোমরা আশ্বস্ত হতে পার যে এতগুলি ভারতীয় ভাষা শেখার জন্য যেটুকু পরিশ্রম করতে হয়, ইংরাজী শেখার তুলনায় তা নগণ্য। ইংরাজী ভাষা আমরা মোটে শিখে উঠতে পারি না। সামান্য জনকয়েক ছাড়া আমাদের পক্ষে এ প্রচেষ্টায় সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়নি। নিজ মাতৃভাষার মত সাবলীলভাবে আমরা এ ভাষায় আমাদের ভাব ব্যক্ত করতে অসমর্থ। সমগ্র শৈশবের স্মৃতি মুছে ফেলার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা করার কি কোন অর্থ হয়? কিন্তু এক বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা গ্রহণ করা আরম্ভ করে আমাদের তথাকথিত উচ্চশিক্ষার সূচনা করার কালে আমরা এই প্রচেষ্টায় আত্ম-নিয়োগ করি। এর ফলে আমাদের জীবনে এমন একটি ফাটল সৃষ্টি হচ্ছে, যা জোড়া লাগাবার জন্য যথেষ্ট দাম দিতে হবে। এইবার তোমরা শিক্ষা ও অস্পৃশ্যতা এই দুটি জিনিসের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখতে পাবে। এমনভাবে জ্ঞান ও শিক্ষার প্রসারের পরও আজ এই যে অস্পৃশ্যতার মনোভাব দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, তার মূল্য তোমাদের চোখে পড়বে। শিক্ষার ফলে মারাত্মক অপরাধ আমাদের নয়নগোচর হয়। কিন্তু আমাদের মনে ভয়ও আছে, সুতরাং এই নীতিকে আমাদের গৃহস্থালীতে আমরা প্রচলিত করতে পারি না। তাছাড়া আমাদের পারিবারিক আচার-বিচার এবং পরিবার-পরিজন সম্বন্ধে আমাদের মনে গোঁড়ামি মিশ্রিত শ্রদ্ধাভাব বিদ্যমান। তোমরা হয়তো বলবে, "আমি অন্ততঃ আর এ পাপের ভাগীদার হব না বললে আমার বাবা-মা প্রাণত্যাগ করবেন।" আমি তোমাদের এই কথা বলব যে, বাবা মারা যাবেন এই ভয়ে প্রহ্লাদ কখনও পবিত্র বিষ্ণুনাম উচ্চারণ করা থেকে বিরত থাকেনি। প্রহ্লাদ তো পিতার উপস্থিতিতেও সারা ঘরকে কৃষ্ণনামের গুঞ্জরণে মুখরিত করে দিত। সুতরাং আমরাও পূজ্য পিতার উপস্থিতিতে এ কাজ করতে পারি। এই কঠিন আঘাতের ফলে তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ যদি সত্যিই দেহত্যাগ করেন, তাহলে আমি তাকে বিপদ বলে মনে করব না। হয়তো এ জাতীয় কিছু রূঢ় আঘাত দিতেই হবে। বহু যুগ ধরে যে সব গোঁড়ামি চলে আসছে তাকে বজায় রাখার জন্য আমরা যতদিন জিদ করব, ততদিন এরকম ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা থাকবে, কিন্তু প্রকৃতির এক মহত্তর বিধান বিদ্যমান এবং সেই মহান নিয়মের খাতিরে আমাদের এবং আমাদের পিতামাতাকে এই ত্যাগ বরণ করতে হবে।

এরপর আসছে—

তাঁত চালানো

তোমরা হয়তো প্রশ্ন করবে, "আমরা আমাদের হাত কাজে লাগাব কেন? দৈহিক শ্রম তো অশিক্ষিতদের করতে হবে। আমি শুধু সাহিত্য ও রাজনৈতিক প্রবন্ধ পাঠ করব।" আমার মনে হয় আমাদের শ্রমের মর্যাদা উপলব্ধি করা দরকার। নাপিত বা মুচি কলেজে পড়লে তার নিজস্ব বৃত্তি কেন ছেড়ে দেবে? আমার মতে নাপিতের পেশা চিকিৎসকের পেশার মতই ভাল।

রাজনীতি

অবশেষে এই সব নিয়মগুলি পালন করার পর (নিশ্চয়ই তার পূর্বে নয়) তোমরা প্রাণ খুলে রাজনীতিতে যোগ দিতে পার এবং নিঃসন্দেহেই তখন আর তোমরা ভুল করবে না। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মনীতির সম্পর্ক না থাকলে তার কোন অর্থ হয় না। ছাত্রসমাজ যদি এ দেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভিড় করে, তবে আমি তাকে জাতীয় উন্নতির স্বাভাবিক লক্ষণ বলতে পারব না। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে ছাত্রাবস্থায় তোমরা রাজনীতি অধ্যয়ন করতে পারবে না। রাজনীতি আমাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল থাকা উচিত ও জাতীয় উন্নতি এবং তার গতি প্রকৃতি আদি সম্বন্ধেও আমাদের সচেতন থাকা বিধেয়। আমাদের শৈশব থেকেই আমরা এ করতে পারি। সুতরাং আমাদের আশ্রমের প্রত্যেকটি শিশুকে আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কার্য-কলাপ সম্বন্ধে জ্ঞানদান করা হয় এবং জাতির দেহের ধমনীতে যে নূতন ভাবের স্রোত বইছে, যে নবীন আশা-আকাঙ্ক্ষা, [illegible] উদ্দীপ্ত হয়ে উঠছে ও যে নব জীবনের সূচনা আমাদের ইতিহাসে হতে চলেছে, সে সম্বন্ধে তাদের অভিজ্ঞ করার প্রচেষ্টা হয়। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে আমরা অনির্বাণ দীপশিখার পরশ চাই। শুধু বুদ্ধি গ্রাহ্য নয়, ধর্মীয় বিশ্বাসের যে নিবাত নিষ্কম্প বর্তিকা-রশ্মি হৃদয়ে চিরস্থায়ী দাগ কেটে যায়, আমরা তারই ছোঁয়া চাই। প্রথমে আমরা এই জাতীয় ধর্মীয় চেতনা হৃদয়ে জাগ্রত করতে চাই এবং আমার মনে হয় এই সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রের দ্বার আমাদের সামনে উন্মুক্ত হয়ে যায়। তদনন্তর ছাত্র এবং আর সকলের পবিত্র কর্তব্য হচ্ছে জীবনের সেই সর্বাঙ্গীন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করা। এর ফলে বয়ঃকালে বিদ্যায়তন ছাড়ার সময় তারা জীবন সংগ্রামে যোগদান করার উপযুক্ত আয়ুধে সজ্জিত হয়ে যাবে। বর্তমানে রাজনৈতিক আন্দোলনের অধিকাংশই ছাত্রদের মধ্যে সীমিত। ফলে বিদ্যায়তন ছেড়ে ছাত্রজীবনের অবসান ঘটা মাত্র এই সব প্রাক্তন ছাত্র বিস্মৃতির অতলতলে তলিয়ে যায় এবং স্বল্প বেতনের স্ফূর্তির সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনধারণোপায় খুঁজে বেড়ানোর জন্য তাদের জীবন থেকে

উচ্চ আশা বিদায় নেয়, ঈশ্বর সম্বন্ধে তারা কিছুই জানে না, মুক্ত বায়ু বা অমলিন আলোক সম্বন্ধে তারা খবর রাখে না এবং পূর্বোক্ত জীবনের যে নীতিসমূহ পালনের ফলে মহান শক্তিশালী স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য-বৃত্তি জাগে, তার লেশমাত্র এই সব প্রাক্তন ছাত্রদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না।

সত্যাগ্রহাশ্রমের সংযোজন

(নিয়ম-কানুন)

এই প্রতিষ্ঠান ১১ই বৈশাখ শুদি ১৯৭১ সম্বতে (২৫শে মে ১৯১৫ খৃষ্ট ব্দ) আহমেদাবাদের নিকটস্থ কোচরাবে স্থাপিত ও পরে সবরমতী নামক আহমেদাবাদের নিকটস্থ একটি জংশন স্টেশনে স্থানান্তরিত হয়।

লক্ষ্য

এই আশ্রমের লক্ষ্য হচ্ছে এই যে এব অধিবাসীবৃন্দ বিশ্বেব সামগ্রিক কল্যাণেব সঙ্গে খাপ খাইয়ে স্বদেশের সেবা ও তাব জন্য যোগ্যতা অর্জন মানসে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করবে।

বিধিপালন

উপরিউক্ত উদ্দেশ্য পূর্তিব জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করা অপবিহার্য :—

১। সত্য

প্রতিবেশী মানবের সঙ্গে সাধাবণ অর্থে মিথ্যা আচবণ করা বা তাদের কাছে মিথ্যা ভাষণ করা থেকে বিরত থাকাকেই সত্যেব ব্রতপালন আখ্যা দেওয়া যায় না। সত্যই ঈশ্বর এবং এই হচ্ছে একমাত্র ও অদ্বিতীয় বাস্তব তথ্য। এই সত্যের সন্ধান ও পূজা থেকে অপবাপর যাবতীয় বিধিব জন্ম। আপাতদৃষ্টিতে যাকে তারা দেশের হিত বলে মনে করে, তাব খাতিরেও সত্যেব পূজারীদের অসত্যেব স্মরণ নেওয়া চলবে না। সত্যের প্রতি চূড়ান্ত আনুগত্যের জন্য প্রয়োজন-বোধে প্রহ্লাদের মত তাদের পিতামাতা আদি গুরুজনের আদেশ সবিনয়ে অমান্য করতে হবে।

২। অহিংসা বা প্রেম

শুধু জীবহত্যা থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়। অহিংসার সক্রিয় দিকটি হচ্ছে প্রেম। ক্ষুদ্র কীটানুকীট থেকে বিশাল বপু মানব পর্যন্ত প্রত্যেকের প্রতি সমদৃষ্টি রাখাই হচ্ছে প্রেমের ধর্ম। এ নিয়ম পালনকারীকে অত্যন্ত গর্হিত কাজের নায়কের প্রতিও ক্রোধ পোষণ করা চলবে না, তিনি তাকে ভালবাসবেন, তার মঙ্গল কামনা

করবেন ও তার সেবা করবেন। দুষ্কৃতিকারীকে এইভাবে ভালবাসলেও তিনি তার অন্যায় আচরণের কাছে নতিস্বীকার করবেন না, বরং সর্বশক্তি প্রয়োগে তিনি এর বিরোধিতা করবেন এবং কোন রকমে ক্ষুব্ধ না হয়ে ধৈর্য সহকারে তিনি এই বিরোধিতার জন্য দুষ্কৃতিকারীর যাবতীয় পীড়ন মাথা পেতে নেবেন।

৩। **ব্রহ্মচর্য**

ব্রহ্মচর্য বিনা উপরিউক্ত বিধিসমূহ পালন করা অসম্ভব। কোন নারী বা পুরুষের প্রতি লালসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত না করাই যথেষ্ট নয়। আমাদের জৈব কামনাকে এমনভাবে আয়ত্তে আনতে হবে, যাতে সে ভাব মন থেকে বিতাড়িত হয়। বিবাহিতদেব স্ত্রী বা স্বামীর প্রতি কামভাব পোষণ করা চলবে না। স্বামী ও স্ত্রী নিজেদের জীবনমরণের সাথী বলে মনে কববে। তাদের মধ্যে একান্ত শুচিতার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। পাপ-ইচ্ছা নিয়ে স্পর্শ, কোন ইঙ্গিত বা কথোপকথন প্রত্যক্ষভাবে এ নীতি ভঙ্গকারী মনোভাব।

৪। **অস্বাদ**

অভিজ্ঞতার ফলে দেখা গেছে যে স্বাদেন্দ্রিয়ের প্রভু না হলে ব্রহ্মচর্য পালন খুবই দুরূহ। এই কারণে অস্বাদকে স্বয়ং একটি ব্রতের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। শরীর রক্ষা এবং দেহকে সেবার উপযোগী রাখাব জন্য আহারেব প্রয়োজন এবং আত্মসুখের জন্য আহার্য গ্রহণ নিষিদ্ধ। সুতরাং যথোচিত সংযম সহকারে ঔষধের মত আহার গ্রহণ করতে হবে। এই নীতি পালনেব জন্য ঝাল, মশলা আদি মুখরোচক দ্রব্য বর্জন কবা প্রয়োজন। মাংস, মদ্য, তামাক এবং ভাঙ্‌ আদি আশ্রমে আসে না। এই নীতি মানতে হলে উৎসব ও নিমন্ত্রণ-বাড়ী ইত্যাদি যেখানে রসনাতৃপ্তি মুখ্য উদ্দেশ্য, তার সংস্রব ছাড়া দরকার।

৫। **অস্তেয়**

না বলে পরের দ্রব্য নেওয়ার অভ্যাস পরিহাব করাই যথেষ্ট নয়। কোন বিশেষ কাজের জন্য একটি জিনিস পেলে তাকে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা বা কোন দ্রব্য ধার নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের বেশী তাকে নিজের কাছে রাখলেও চৌর্যাপরাধে অপরাধী হতে হয়। যতটুকু প্রয়োজন, তার বেশী নিলেও এই একই দোষ হয়। এই নীতির মূল কথা হচ্ছে এই যে আমাদের দৈনন্দিন প্রয়োজনের পক্ষে যতটুকু ঠিক যথেষ্ট, প্রকৃতি ততটুকুরই মাত্র সংস্থান করে।

৬। **অপরিগ্রহ**

এ নীতি আসলে অস্তেয়রই অংশবিশেষ। শুধু যতটুকু প্রয়োজন তার চেয়ে বেশী যেমন গ্রহণ করা উচিত নয়, তেমনি তা নিজ আয়ত্তে রাখাও বিধেয় নয়।

অপ্রোয়জনীয় খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং আসবাবপত্র নিজের কাছে রাখলে এ নীতি ভঙ্গ করা হয়। কারও যদি চেয়ার ছাড়া চলে যায়, তবে একটিও চেয়ার রাখার প্রয়োজন নেই। এই নীতি পালন করার কালে জীবনযাত্রা পদ্ধতিকে ক্রমশঃ সরল করে তুলতে হয়।

৭। শরীর শ্রম

অস্তেয় এবং অপরিগ্রহ নীতি আচরণ করার জন্য শরীর শ্রম অপরিহার্য। মানুষ যদি সমাজের ক্ষতি না করতে চায় তবে নিজ দেহধারণের জন্য তার শরীর শ্রম করা উচিত। প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ শরীরসম্পন্ন ব্যক্তির স্বয়ং নিজ ব্যক্তিগত কাজগুলি করে নেওয়া উচিত। যথোপযুক্ত কারণ না হলে তারা যেন এজন্য অপর কারও সহায়তা না নেয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই তাদের আবার একথাও মনে রাখতে হবে যে রুগ্ন, বৃদ্ধ ও অসমর্থ ব্যক্তি এবং শিশুদের সেবা করার দায়িত্ব বাধ্যতামূলকভাবে তাদের উপর এসে পড়ে।

৮। স্বদেশী

মানুষ সর্বশক্তিমান নয়। সুতরাং তার পক্ষে বিশ্বের সেবা করার প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে প্রথমে নিজ প্রতিবেশীর সেবা করা। এই হচ্ছে স্বদেশী ব্রত এবং যদি কেউ তার নিকটস্থ ব্যক্তিকে সেবা করার বদলে দূর দেশে অবস্থিত ব্যক্তির সেবা করছি বলে, তাহলে এই নীতি ভঙ্গ করা হয়। স্বদেশী ব্রত পালনে বিশ্বের নিয়মশৃঙ্খলা বজায় থাকে এবং এর ব্যতিক্রমের ফলে গোলযোগ সৃষ্টি হয়। এই নীতি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় দ্রব্যসমূহ আমাদের যথাসম্ভব স্থানীয় বাজার থেকেই কিনতে হবে এবং যে দ্রব্য সহজে নিজ দেশে উৎপন্ন হতে পারে, তার জন্য বিদেশ থেকে আমদানির উপর নির্ভর করা চলবে না। স্বদেশীতে স্বীয় স্বার্থ সাধনের স্থান নেই। এই আদর্শের বেদীমূলে নিজেকে পরিবারের কাছে, পরিবারকে গ্রামের কাছে, গ্রামকে দেশের কাছে ও দেশকে সমগ্র মানব সমাজের জন্য আত্মবলি দিতে হবে।

৯। নির্ভিকতা

ভয়ের প্রভাবাধীন থাকাকালীন কারও পক্ষে সত্য বা প্রেমের অনুবর্তী হওয়া অসম্ভব। দেশে এখন আতঙ্কের রাজত্ব চলছে বলে নির্ভিকতার চর্চা ও এ সম্বন্ধে চিন্তা করার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এইজন্যই কৃত্য হিসেবে এর পৃথকভাবে উল্লেখ করা হল। সত্য-সন্ধানীকে পিতামাতা, জাতি, সরকার বা দস্যুআদির ভয় বিসর্জন দিতে হবে এবং দারিদ্র্য বা মৃত্যুর জন্য তার আতঙ্কিত হওয়া চলবে না।

১০। অস্পৃশ্যতা দুরীকরণ

যে অস্পৃশ্যতা আজ হিন্দুধর্মের এত গভীরে তার মূল বিস্তার করেছে, তা

একেবারে ধর্মনীতি বিরোধী। এই কারণে এই পাপ দূরীকরণের কাজকে একটি স্বতন্ত্র নীতির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। আশ্রমে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের স্থান অন্যান্য জাতিদের সমানই। জাতি ভেদ প্রথার উচ্চনীচ ভাবনা এবং পরস্পরের সম্পর্কে এলে অশুচি হয়ে পড়ার সংস্কার প্রেমধর্ম বিরোধী বলে আশ্রমে জাতিভেদ প্রথা মানা হয় না। আশ্রম অবশ্য বর্ণাশ্রম ধর্মকে শ্রদ্ধা করে। বর্ণবিভাগের ভিত্তি হচ্ছে বৃত্তির উপর এবং প্রত্যেকের কর্তব্য হচ্ছে তার পৈতৃক পেশা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা। তবে এ মানুষের মৌলিক নীতিবিরুদ্ধ হবে না এবং এই পথের পথিককে তার অবসর সময় ও উদ্বৃত্ত কর্মশক্তিকে সত্যকার জ্ঞান অর্জন ও প্রসারের কাজে নিয়োজিত করতে হবে। স্মৃতিসমূহে উল্লিখিত চতুর্বিধ আশ্রম প্রথা মানব জাতির মঙ্গলসূচক। সুতরাং আশ্রম বর্ণাশ্রম ধর্মে বিশ্বাস করলেও এখানে বর্ণভেদের স্থান নেই। কারণ আশ্রম জীবন ভগবদগীতার সন্ন্যাসের আদর্শে রচিত।

১১। সহনশীলতা

আশ্রমিকগণ বিশ্বাস করেন যে বিশ্বের প্রমুখ ধর্মমত সমূহে সত্যের স্বরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। তবে এর প্রত্যেকটিই মানবের মত অসম্পূর্ণ সত্ত্বা কর্তৃক প্রবর্তিত বলে এর মধ্যে অপূর্ণতার ছোঁয়া আছে এবং কিছু কিছু অসত্যেরও সংমিশ্রণ ঘটেছে। সুতরাং প্রত্যেকরই কর্তব্য হচ্ছে অপরের ধর্মমতকে নিজধর্মের সমান মর্যাদা দেওয়া। এই জাতীয় সহনশীলতা জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে গেলে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ থাকে না এবং এই কারণে কারও ধর্মান্তরকরণের কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যে বিভিন্ন ধর্মমতগুলি যেন তাদের ত্রুটি দূর করতে পারে এবং সবগুলি যেন একযোগে পূর্ণতার পথে চলে।

কার্যক্রম

এই সকল নীতির ফলস্বরূপ আমাদের এই উদ্দেশ্যের পরিপূর্তি মানসে আশ্রমে নিম্নরূপ কার্যক্রম অনুসৃত হয়।

১। প্রার্থনা

প্রত্যহ আশ্রমের সামাজিক (ব্যক্তিগত নয়) কার্যক্রম সুরু হয় প্রত্যূষের 8-১৫ মিনিট থেকে 8-8৫ মিনিটের সমবেত প্রার্থনা থেকে এবং এর অবসান হয় রাত্রি ৭টা থেকে ৭—৩০ মিনিট পর্যন্ত প্রার্থনার পর। আশ্রমস্থ প্রত্যেকটি ব্যক্তির প্রার্থনায় যোগদান করা নিয়ম। আত্মশুদ্ধি এবং নিজের সব কিছু ঈশ্বরের পদপ্রান্তে সমর্পণ করাই হচ্ছে প্রার্থনার উদ্দেশ্য।

ও অহিংসার অনুকূল উপায় অবলম্বন করবেন এবং সদাই তাঁরা এই নীতি পালনের জন্য সজ্ঞানে প্রযত্ন করবেন।

৪। বিদ্যাপীঠের অধ্যাপকবর্গ ও অছিগণ এবং এর সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ অস্পৃশ্যতাকে হিন্দুসমাজের কলঙ্কস্বরূপ জ্ঞান করবেন এবং এই পাপ অপনোদনের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা কববেন। অস্পৃশ্যতার অপরাধে কোন বালক-বালিকা এই বিদ্যাপীঠে প্রত্যাখ্যাত হবে না বা একবার এরকম কাউকে গ্রহণ করার পর তার প্রতি পার্থক্যমূলক আচরণ করা হবে না।

৫। বিদ্যাপীঠ এবং এতদসংশ্লিষ্ট যাবতীয় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ ও অছিগণ সুতাকাটাকে স্বরাজ প্রাপ্তির আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করবেন এবং নিতান্ত অশক্ত না হলে নিয়মিতভাবে সুতা কাটবেন ও খাদি পরিধান করবেন।

৬। বিদ্যাপীঠে প্রাদেশিক ভাষা প্রমুখ স্থান অধিকার করবে এবং এই ভাষাই শিক্ষাব বাহন হবে।

ব্যাখ্যা :—গুজরাটি ছাড়া অন্যান্য ভাষা প্রত্যক্ষ কথোপকথোন দ্বাবা শেখানো যেতে পাবে।

৭। বিদ্যাপীঠেব পাঠ্যক্রমে হিন্দি-হিন্দুস্থানী শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

৮। শবীরশ্রমের শিক্ষা বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করার শিক্ষাব মতই গুরুত্বপূর্ণ এবং তাই জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় বৃত্তিসমূহ শেখানো হবে।

৯। জাতির উন্নতি নগব নয়, গ্রামের উপব নির্ভরশীল বলে, বিদ্যাপীঠেব বেশীর ভাগ অর্থ ও প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ অধ্যাপক গ্রামীন জনতার হিতকারী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হবেন।

১০। পাঠ্যক্রম নির্ধারণকালে গ্রামবাসীদের প্রয়োজনীয়তার কথা প্রথমে বিবেচনা করতে হবে।

১১। বিদ্যাপীঠ পরিচালিত ও এর সঙ্গে যুক্ত যাবতীয় প্রতিষ্ঠানে প্রতিটি প্রচলিত ধর্মমতের প্রতি সমদৃষ্টি থাকবে এবং ছাত্রদের আধ্যাত্মিক বিকাশের জন্য সত্য ও অহিংসানুগ ধর্মশিক্ষা দেওয়া হবে।

দ্রষ্টব্য :—হিন্দি-হিন্দুস্থানীর অর্থ হচ্ছে এমন একটি ভাষা যা উত্তরখণ্ডের হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সাধারণতঃ বলে থাকে এবং দেবনাগরী ও আরবী, এই উভয়বিধ লিপিতেই তা লেখা যায়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবাবলী

পরিচালকমণ্ডলী নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবসমূহ গ্রহণ করেছেন :—

১। স্থায়ী-অস্থায়ী নির্বিশেষে আশ্রমের দায়িত্বশীল কর্মী ও অধিবাসীবৃন্দ ব্রহ্মচর্য পালন করবেন।

২। আশ্রমে যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিদের নিজগৃহে পূর্বোল্লিখিত নিয়মগুলি অন্তত একবৎসর পালন করে আসতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করার ক্ষমতা অধ্যক্ষের থাকবে।

৩। পৃথক করে আর পাকশালা সুরু করা কাম্য নয় বলে ভবিষ্যতে বিবাহিত বা অবিবাহিত নির্বিশেষে প্রতিটি নবাগতকে সার্বজনীন পাকশালায় আহার্য গ্রহণ করতে হবে।

অতিথিদের প্রতি

দর্শক ও অতিথির সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। আগন্তুকদের আশ্রমের বিভিন্ন কার্যকলাপ দেখানোর যথাসাধ্য ব্যবস্থা করা হয়।

আশ্রমে থেকে আশ্রম দেখতে ইচ্ছুক ব্যক্তিবা যেন এর জন্য পূর্বাহ্নে সম্পাদকের কাছে আবেদন করেন এবং আবেদনের সম্মতিজ্ঞাপক উত্তর না পেলে যেন এখানে না আসেন।

আশ্রমে খুব বেশী বিছানা বা বাসনপত্র নেই। সুতরাং আশ্রমে এসে যাঁরা থাকবেন তাঁরা যেন নিজের বিছানা, মশারী, গামছা, থালা, বাটী ও গেলাস আনেন।

পাশ্চাত্যের দর্শকদের জন্য কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। তবে যাঁরা মেঝেতে বসে খেতে অভ্যস্ত নন, তাঁদের একটু উঁচু আসন দেবার চেষ্টা করা হয়। কমোড অবশ্য তাঁদের দেওয়া হয়।

অতিথিদের নিম্নলিখিত নিয়মগুলি মেনে চলতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে :—

১। প্রার্থনায় যোগদান।

২। নীচের দৈনিক কর্মসূচীতে যে খাবার সময়ের উল্লেখ আছে তার প্রতি খেয়াল রাখবেন।

প্রত্যহিক কর্মসূচী

সকাল ৪ ঘটিকায়	শয্যাত্যগ
„ ৪-১৫ মিঃ থেকে ৪-৪৫ মিঃ	প্রাতঃকালীন প্রার্থনা
„ ৫টা থেকে ৬-১০ „	স্নান, ব্যায়াম ও অধ্যয়ন

সকাল	৬-১০	„	৬-৩০	„	প্রাতরাশ
„	৬-৩০	„	৭টা		মহিলাদের প্রার্থনার বর্গ
সকাল	৭টা	থেকে	১০-৩০	মিঃ	শরীরশ্রম, শিক্ষা ও সাফাই
বেলা	১০-৪৫ মিঃ	„	১১-১৫	„	মধ্যাহ্ন ভোজন
„	১১-১৫ „	„	১২টা		বিশ্রাম
„	১২টা	„	৪-৩০	„	শরীরশ্রম ও বর্গ
বৈকাল	৪-৩০ „	„	৫-৩০	„	খেলাধূলা
„	৫-৩০ „	„	৬টা		নৈশভোজন
সন্ধ্যা	৬টা	„	৭টা		বিরাম
রাত্রি	৭টা	„	৭-৩০	মিঃ	সমবেত প্রার্থনা
„	৭-৫০ „	„	৯টা		বিরাম
„	৯টা				শোবার ঘণ্টা

দ্রষ্টব্য :—প্রয়োজন বোধে কর্মসূচীর পরিবর্তন হবে।

৭। আচার্যের অভিভাষণ *

আমার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য অনুষ্ঠান থেকে আজকের আয়োজন পৃথক। এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাকে আমি অতীব দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্য বলে মনে করি। জাতির কোনরূপ অনিষ্ট সাধন করে ফেলছি বলে আমার মনে এই উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়নি, আমার শুধু মনে হচ্ছে যে আমি এ কার্যের যথোপযুক্ত ব্যক্তি নই। শিক্ষা বলতে সত্য সত্য যা বোঝায়, এই কলেজটি যদি তার প্রচারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হত, তাহলে আমার মনে এই অযোগ্যতার ভাবনা জাগত না। কিন্তু মহাবিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য শুধু ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া নয়; ছাত্রদের জীবিকার সন্ধান করে দেওয়াও এর লক্ষ্য। এই দৃষ্টিকোণ থেকে গুজরাট কলেজের সঙ্গে মহাবিদ্যালয়ের তুলনা করলে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই। গুজরাট কলেজ একটি বিরাট ব্যাপার; কিন্তু আমাদের মহাবিদ্যালয় সে তুলনায় নগণ্য। তবে আমার মতে এটি একটি মহান প্রতিষ্ঠান। গুজরাট কলেজে ইঁট-কাঠ আর চুন-সুরকি বেশী লেগেছে। প্রতিষ্ঠানের গুণ বিচারের জন্য অট্টালিকা ও অন্যবিধ সাধন-সামগ্রী যে যথেষ্ট মানদণ্ড নয়, এ বিশ্বাস আমি যদি তোমাদের মনে সৃষ্টি করতে পারতাম, তাহলে বড় ভাল

*১৫ই নভেম্বর, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে আহমেদাবাদে গুজরাট বিদ্যাপীঠের গুজরাট মহাবিদ্যালয়ের উদ্বোধন দিবসে গান্ধীজী প্রদত্ত বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত সার।

হ'ত। ঈশ্বরের কাছে আমি প্রার্থনা করি যে আমাদের আদর্শ সম্বন্ধে তোমাদের মনে আমারই মত দৃঢ়মূল প্রতীতি জন্মাক।

আজকের অবস্থা হচ্ছে এই যে দেশের সূচ্যগ্র ভূমিও আমাদের নয়, সবই এক বিদেশী সরকারের অধীন। শুধু এই মাটি আর গাছপালাই নয়; আমাদের দেহগুলিও তাদের দখলে এবং নিশ্চিতভাবে একথা বলা মুস্কিল যে আমরা আমাদের আত্মার স্বামী কিনা। এই যখন আমাদের অবস্থা তখন জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের জন্য সুন্দর একটি অট্টালিকা বা এর অধ্যাপক পদের জন্য খুব জ্ঞানী ব্যক্তি পাবার আশা করা অনুচিত। এমন কি একজন লোক যদি এসে আমাদের জানায় যে আমাদের আত্মার জ্যোতি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে এবং আমাদের দেশ থেকে প্রাচীনকালের প্রজ্ঞা বিদায় নিয়েছে, তাহলে অন্যান্য বিষয়ে সে অজ্ঞ হলেও আমি তো সানন্দে তাকে তোমাদের অধ্যক্ষের পদে নিয়োগ করব। তবে আমি বলতে পারছি না যে তোমরা একজন পশুপালককে এইভাবে গ্রহণ করতে পারবে কিনা। সেইজন্য আমাদের শ্রীযুক্ত গিদওয়ানীকে খুঁজে বের করতে হয়েছে। আমি স্বীকার করছি যে তাঁর ডিগ্রীগুলির প্রতি আমি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করি না। এই কলেজে পৃথক ধরণের মূল্যমান বিদ্যমান। চরিত্রের কষ্টিপাথরে যাচাই করলে এখন যা পিতল মনে হচ্ছে, তাই সোনা বলে ধরা পড়বে।

আদর্শ চরিত্রের সিন্ধি, মারাঠী ও গুজরাটী অধ্যাপকমণ্ডলী পাওয়ায় আমরা নিজেদের সৌভাগ্যবান মনে করি।

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সমবেত ভদ্রমহোদয় ও মহিলাদের আমি প্রাণভরে এই মহাবিদ্যালয়কে আশীর্বাদ করতে অনুরোধ জানাই। ভারতের আত্মার পুনরভ্যুদয়ের জন্য প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানে নিজ পুত্রকন্যাকে পাঠিয়ে তাঁরা সবচেয়ে ভালভাবে এর প্রতি আশীর্বচন উচ্চারণ করতে পারেন। অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে ভারতবাসী স্বাধীন। তবে অর্থাভাবে কাজের অগ্রগতি রুদ্ধ হয় না। অগ্রগতি রুদ্ধ হবার কারণ হচ্ছে মানুষের অভাব, নেতার অভাব এবং নেতা জুটলে তার অনুগামীর অভাব। আমি অবশ্য মনে করি যে যোগ্য নায়কের কখনও অনুগামীর অভাব ঘটে না। মেঝে যতই খারাপ হোক না কেন, নাচিয়ে কখনও বলে না যে উঠোন বাঁকা, ঐ উঠোনেই সুষ্ঠুভাবে সে কাজ চালিয়ে নেয়। নেতার বেলাতেও ঠিক এই কথা খাটে। জাতশিল্পী হলে তিনি কাদাকে সোনায় রূপান্তরিত করবেন। আমি প্রার্থনা করি যে তোমাদের অধ্যাপকমণ্ডলী যেন এই জাতীয় জীবনশিল্পী হয়ে ওঠেন।

শুধু শেখায় কোন কাজ হবে না। স্বরাজ অর্জন করতে হবে আমাদের

চরিত্রের অধিকারী হতে হবে। আমাদের শান্তিময় ও আধ্যাত্মিক আন্দোলন ত্রুটীযুক্ত হলেও বিদেশী শাসকবর্গের শয়তানোচিত হিংসার সম্মুখীন হবার জন্য এই আমাদের আয়ুধ। ঈশ্বর-নির্দিষ্ট কাল পূর্ণ হলে যাতে মুক্তির বীজ সুন্দর স্বরাজ বৃক্ষে রূপায়িত হয়, সেজন্য এ বীজ বপন করে এতে জল সিঞ্চন করতে হবে। চারিত্রশক্তি ছাড়া এর বৃদ্ধি সম্ভব নয়। তোমাদের শিক্ষকবৃন্দ একথা সদাসর্বদা স্মরণ রাখলে আর সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি জানি তাঁরা এ আদর্শ পূর্ণ করার জন্য জীবন পণ করেছেন। আর এর জন্য মৃত্যু বরণ করা তো আসলে চিরজীবি হওয়া।

অধ্যাপকবর্গ তাদের কর্তব্য সম্পাদন করবেন ধরে নিলে ছাত্রদের আমার আর কিছু বলার থাকে না। ছাত্র বেচারীরা তো প্রচলিত পরিস্থিতির প্রতিচ্ছবি। তারা যদি উদ্যমী, সত্যবাদী ও নির্মল হৃদয়ের না হয়, তবে তার জন্য দোষী হচ্ছেন তাদের পিতামাতা, তাদেব শিক্ষকগণ ও তাদেব শাসকবর্গ। "যথা রাজা তথা প্রজা" কথাটি যদি সত্য হয়, তবে যেমন প্রজা তেমনি রাজা কথাটিও সত্য। আমাদের জাতীয় চরিত্রেব ত্রুটী দূব করার জন্য আমরা অর্থাৎ অভিভাবকবর্গ ও শিক্ষকগণ যেন বদ্ধপরিকর হই।

দেশের প্রতিটি গৃহই হচ্ছে বিদ্যালয় এবং মাতাপিতা তার শিক্ষক। কিন্তু শিক্ষাদানে বিরত থেকে পিতামাতা তাঁদের পবিত্র কর্তব্য থেকে চ্যুত হয়েছেন। বিদেশী সভ্যতার বর্তমান রূপ দেখে এর প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নেই এবং এব গুণাগুণ সম্বন্ধেও আমাদের বিশেষ জ্ঞান নেই। আমবা যেন ধার করে বা বরং চুরি করে সভ্যতার বহিরাবরণ ধারণ কবেছি। এই চোরাই মালে আমাদের কোন রকম উন্নতি সম্ভব নয়।

এটি আমাদের মুক্তি মন্দির, পুঁথিগত বিদ্যার দেউল নয়। চরিত্র গঠন আমাদের কর্তব্য। একাজে ছাত্রদের মধ্যে আমরা যে মাত্রায় সাফল্য অর্জন করব, স্বরাজ অর্জনের সেই পরিমাণ যোগ্য হয়েছি বলে মনে করব। ছাত্রদের সঙ্গে কাজ করাই স্বরাজ গড়ে তোলার একমাত্র উপায়। আজ যে ধরণের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হল তার পিছনে আমাদের নিজ সম্পদ ও হৃদয় সমর্পণ করতে হবে।

কথা বলার সময় আর নেই, কর্মের মহা লগ্ন সমুপস্থিত। যেসব ছাত্র এই জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে যোগদান করেছে, তাদের আমি অর্ধেক শিক্ষক বিবেচনা করি। তারা এই মহাবিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর সংস্থাপন করেছে। এইজন্য তাদের নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। এ অনুষ্ঠানের পুরোদস্তুর কুশীলব তারা। তারা যদি নিজ ভূমিকা যথাযথভাবে গ্রহণ না করে, তবে শিক্ষকদের উদ্যমের অধিকাংশ বৃথা যাবে। কেন তারা সরকারী কলেজ ছেড়ে এ প্রতিষ্ঠানে যোগ

দিয়েছে এবং এখানে তারা কি পাবার আশা রাখে, একথা ছাত্রদের জানতে হবে। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম হয়তো দীর্ঘকালব্যাপী হবে। ভগবান যেন ছাত্রদের শেষপর্যন্ত ঠিক থাকার শক্তি দেন। শেষ পর্যন্ত তোমাদের মধ্যে জনকয়েকও যদি ঠিক থাক, তবে তোমরা শুধু এই মহাবিদ্যালয়ের গর্বের বস্তু বলে আখ্যাত হবে না, তোমরা হবে তোমাদের মাতৃভূমির গৌরব। গুজরাটের ধন সম্পদ ও জ্ঞানের জন্য তোমরা সে মর্যাদা পাবে না, সে সম্মান পাবার কারণ হচ্ছে এই যে এ প্রদেশে অসহযোগের বীজ বপন করা হয়েছে ও অংকুরিত হবার জন্য তাকে যত্ন করা হয়েছে। আত্মপ্রশংসা এ নয়, কারণ আমি তো শুধু জনসাধারণের সামনে এর কল্পনা পেশ করেছিলাম। জনগণই উৎসাহভরে এ পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে এবং যথোচিত নিষ্ঠা সহকারে আমার বিশ্বাসের সঙ্গে একাত্ম হয়। আমার চোখের সামনে ঐ বৃক্ষগুলি যেমন বাস্তব, তেমনি অহিংস অসহযোগও যে ভারতের মুক্তি আনবে এও বাস্তব। আর এই মহাবিদ্যালয় হচ্ছে সেই মহান আন্দোলনের ইন্দ্রিয়গোচর প্রতীক। আমি শুধু এর একটি পত্র এবং তাও শুষ্কপত্র। শিক্ষকরাও এর পত্র, তবে তাঁরা কথঞ্চিৎ সজীব। কিন্তু তোমরা এই ছাত্রের দল হচ্ছ এর শাখা-প্রশাখা এবং এর থেকে একদল নূতন শিক্ষক জন্মলাভ করবে। আমার প্রতি তোমাদের যে আস্থা, সে আস্থা তোমাদের শিক্ষকদের উপরও হোক। তাঁদের ভিতর আদর্শ চিত্তবৃত্তির অভাব দেখলে প্রহ্লাদ যেমন তার পিতাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন, তোমরাও তেমনি তাঁদের নাকচ করে তাঁদের ছাড়াই এগিয়ে চল।

আমি কামনা করি যে এই মহাবিদ্যালয় যেন ঈশ্বরের অবদান হয়, এ যেন আমাদের স্বরাজ অর্জনের অন্যতম শক্তিশালী আয়ুধ হয় এবং শুধু ভারতের হিতসাধনেই আমাদের স্বাধীনতারূপী স্রোতস্বতীর জলস্রোত নিঃশেষ না হয়ে সমগ্র বিশ্ব যেন তার কল্যাণধারায় নিষিক্ত হয়।

৮। ইংরাজীর স্থান

আমি বলেছি যে হিন্দুস্থানী শেখার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্ররা যেন পরিবর্তনের সময়, অর্থাৎ হীন অবস্থা থেকে সমমর্যাদায় উন্নীত হবার কালে, বিদেশীর অধীনতা পাশ ছিন্ন করে স্বরাজ অর্জন করার সময়, অসহায় অবস্থা থেকে আত্মশক্তির উপাসক হবার কালে ইংরাজী শিক্ষা মুলতুবী রাখে। আগামী কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্বে আমরা যদি স্বরাজ চাই, তাহলে আমাদের হৃদয়কে স্বরাজপ্রাপ্তির সম্ভাবনায়

উদ্দীপ্ত করতে হবে এবং সেই শুভদিনটিকে এগিয়ে আনার জন্য আমাদের যথাসাধ্য প্রযত্ন করতে হবে ও যে কাজে সেই শুভলগ্ন এগিয়ে আসে না বা বস্তুতঃ তার আবির্ভাব বিলম্বিত হয়, তেমন কিছু কারও করা উচিত নয়। আমাদের ইংরাজী ভাষার জ্ঞানবৃদ্ধির দ্বারা সে আদর্শ পরিপূর্তির পথে আমাদের গতিবেগ বৃদ্ধি পাবার পরিবর্তে বরং গতি রুদ্ধ হবে। বহুক্ষেত্রে এই গতি রুদ্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কাই সত্য; কারণ অনেকে বিশ্বাস করেন যে আমাদের কণ্ঠনিঃসরিত ইংরাজী শব্দাবলী তাঁদের কর্ণকুহরে সুর-ঝঙ্কার সৃষ্টি না করলে আমাদের মধ্যে স্বাধীনতা স্পৃহা জাগ্রত করা সম্ভবপর নয়। চূড়ান্ত বুদ্ধিহীনতার নিদর্শন এ। এ হলে স্বরাজ "দূর অস্ত"। ইংরাজী আন্তর্জাতিক ব্যবসা বাণিজ্যের ভাষা, কূটনীতিজ্ঞদের মুখপত্র এই ভাষা এবং বহু সাহিত্য সম্পদের আধার ও এর মারফৎ আমরা পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও সভ্যতার পরিচয় পেতে পারি। সুতরাং আমাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনের ইংরাজী জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। তাঁরা জাতীয় বাণিজ্য বিভাগ ও আন্তর্জাতিক কূটনীতির কর্ণধার হবেন এবং পশ্চিমের সাহিত্য, চিন্তাধারা ও বিজ্ঞানের সঙ্গে দেশবাসীকে পরিচিত করবেন। এই হবে ইংরাজীর সমুচিত প্রয়োগ। পক্ষান্তরে ইংরাজী আজকে আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে স্থান নিয়েছে ও আমাদের মাতৃভাষাকে হৃদি-সিংহাসনচ্যুত করেছে। ইংরাজদের সঙ্গে আমাদের বিসম সম্পর্কের এক অস্বাভাবিক পরিণতি এ। ইংরাজীর বিন্দুমাত্র জ্ঞান বিনা ভারতীয় লোকমানসের সর্বোত্তম বিকাশ হওয়া প্রয়োজন। এই মনোভাবের ফলে এদেশের পুরুষ সমাজ ও বিশেষতঃ নারী সমাজের প্রচণ্ড ক্ষতি হচ্ছে; কারণ আমাদের দেশের ছেলেমেয়েরা মনে করে যে ইংরাজীর জ্ঞান না থাকলে সংস্কৃতি সম্পন্ন সমাজে স্থান লাভ করা যায় না। এই রকম অপমানকর চিন্তাধারা বরদাস্ত করা যায় না। ইংরাজীর মোহমুক্ত হওয়া স্বরাজপ্রাপ্তির যোগ্যতা বিচারের অন্যতম মানদণ্ড।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২-২-১৯২১

৯। ঈশ্বর, সম্রাট ও দেশের জন্য

ভ্রমণকালে আমি একবার একদল গণবেশে (য়ুনিফর্ম) সজ্জিত বালক দেখতে পেয়ে তাদের কাছ থেকে তাদের গণবেশের অর্থ জানতে চাইলাম। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম তাদের গণবেশ হয় বিদেশী বস্ত্রে আর নয় বিদেশী সুতার বস্ত্রে প্রস্তুত। শুনলাম, ও হচ্ছে স্কাউটের পোশাক। জবাব শুনে আমার কৌতূহল

গভীর হল। স্কাউট হিসাবে তাদের কি করতে হয়, একথা জানার ইচ্ছা জাগল। জবাব পেলাম যে ঈশ্বর, সম্রাট ও দেশের জন্য তারা জীবনধারণ করে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "তোমাদের সম্রাট কে?" জবাব পেলাম, "সম্রাট পঞ্চম জর্জ"।

—তাহলে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনা সম্বন্ধে তোমার অভিমত কি? ধর ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১৩ই এপ্রিল তুমি যদি সেখানে থাকতে এবং জেনারেল ডায়াব যদি তোমাদের ভীতিবিহ্বল দেশবাসীব প্রতি গুলি চালাতে বলতেন, তাহলে তুমি কি করতে?

—আমি কিছুতেই সে হুকুম মানতাম না।

—কিন্তু জেনারেল ডায়ার তো সম্রাট নির্দিষ্ট গণবেশ পরেছিলেন।

—কথাটা ঠিক। কিন্তু তিনি হচ্ছেন আমলাতন্ত্রের অঙ্গ। ওর সঙ্গে আমাদেব সম্পর্ক নেই।

আমি তাকে বুঝিয়ে বললাম যে, আমলাতন্ত্রকে সম্রাটের থেকে পৃথক করা যায় না; কারণ সম্রাট হচ্ছেন একটি নৈব্যক্তিক আদর্শ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমঅর্থ সূচক। সাম্রাজ্যের যে রূপ এখন দৃষ্টিগোচব হচ্ছে, তাতে কোন ভারতবাসীর পক্ষে আনুগত্য বলতে ঠিক যা বোঝায়, ঈশ্বরের প্রতি অনুগত থেকে এই সাম্রাজ্যের প্রতি সে ভাব পোষণ করা সম্ভব নয়। যে সাম্রাজ্য সামরিক আইন বলবৎ করে দেশের বুকেব উপব দিয়ে দমননীতির রথ ছোটাবার জন্য দায়ী এবং দুষ্কৃতির জন্য যার মনে বিন্দুমাত্র অনুতাপ নেই, পবিত্র দায়িত্বেব ভার পদদলিত করে যারা গোপন চুক্তি সম্পন্ন করে, তাকে ঈশ্বরের সম্পর্কবিহীন সাম্রাজ্য ছাড়া আর কিছু আখ্যা দেওয়া যায় না। এরকম সাম্রাজ্যের প্রতি অনুগত থাকার অর্থ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা।

ছেলেটি হতচকিত হয়ে পড়ল।

আমি আমার যুক্তি পেশ করতে লাগলাম। "ধর আমাদের দেশ যদি ধনার্জনের জন্য ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে এবং আমাদের মাতৃভূমি যদি অন্য সকলকে শোষণ করে, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা করে এবং বাণিজ্য বিস্তার মানসে যুদ্ধ আরম্ভ করে ও ক্ষমতা ও মর্যাদা কায়েম রাখার জন্য ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়, তাহলে যুগপৎ ঈশ্বর ও দেশের প্রতি অনুগত থাকা কি করে সম্ভব? ঈশ্বরের জন্য আমাদের কি দেশকে ভুলে যাওয়া উচিত নয়? সেইজন্য আমার অভিমত হচ্ছে এই যে তোমরা শুধু ঈশ্বরের প্রতিই বিশ্বাসী ও অনুগত থাকবে। একই অর্থে এবং একই সময়ে আর কারও প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন কোরো না।"

ছেলেটির অনেকগুলি সাথী গভীর আগ্রহভরে এই আলোচনা শুনছিল।

তাদের দলপতিও এগিয়ে এল। তার কাছে আমি আমার যুক্তির পুনরাবৃত্তি করলাম এবং তাকে বললাম যে, সে নিজে যেন খানিকটা ঝক্কি নিয়েও তার নেতৃত্বাধীন বয়ঃপ্রাপ্ত যুবকদের অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি বাড়িয়ে তোলে। এই চিত্তাকর্ষক বিষয়েব আলোচনা শেষ হতে না হতেই স্টেশন থেকে গাড়ী ছেড়ে দিল। ঐসব সুন্দর সুন্দর ছেলেদের সঙ্গ হারিয়ে মনে দুঃখ হল এবং এই সময় অসহযোগ আন্দোলনের অন্তর্নিহিত অর্থ ভাল ভাবে আমি বুঝতে পারলাম। মানুষের কাছে একটিমাত্র বিশ্বজনীন নীতি হতে পাবে এবং এ হচ্ছে ঈশ্বরানুগত্য। একেবাবে বিপরীতধর্মী না হলে সম্রাট, দেশ ও মানবতাব প্রতি আনুগত্যও এর ভিতর স্থান পায়। তবে সময় সময় ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্যে এসবেব কোনটার স্থান থাকে না। আমি আশা করি যে দেশেব যুব সম্প্রদায় এবং তাদের শিক্ষকবর্গ নিজেদের ভ্রান্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাদের আদর্শেব যথোচিত সংস্কাব করবেন। যে নীতি ধোপে টেকে না, তাকে সুকুমাবমতি তরুণদের উপর চাপিয়ে দেওয়া কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৩-৩-১৯২১

১0। পিতামাতার কর্তব্য

"এ বৎসব আমার ২১ বৎসর বয়স্ক তৃতীয় পুত্র বহু ব্যয়ে অনার্সসহ বি. এ. পাশ করেছে। সে সরকারী চাকবি কবতে চায় না। জাতির সেবাই তার ধ্যেয়। আমার পরিবারে বারোজন লোক। এখনও পাঁচটি ছেলের শিক্ষা বাকী। কিছু জমিজমা ছিল ; কিন্তু ২০০০৲ টাকার ঋণ শোধ করতে তা বিক্রী করতে হয়েছে। তিনটি ছেলেকে শিক্ষা দিতে আমি প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছি। মনে এই আশা ছিল যে তৃতীয় পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ ডিগ্রী পেয়ে আমার রিক্তপ্রায় অবস্থার পুনরভ্যুত্থান করবে। সারা পরিবারের দায়িত্ব সে নেবে বলে আশা করেছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে যে সমগ্র পরিবারকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে হবে। একদিকে কর্তব্য এবং অন্যদিকে আদর্শের সংঘাত সৃষ্টি হচ্ছে। আমি আপনার সুবিবেচনা-প্রসূত সদুপদেশ প্রার্থী।"

এই হচ্ছে একটি বিশিষ্ট ধরণের চিঠির নমুনা। আর বর্তমান শিক্ষার ফলে প্রায় সর্বত্র এই মনোভাবই দৃষ্ট হয় বলে বহুদিন যাবৎ আমি আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতির বিরুদ্ধে এবং আমার সবগুলি ছেলে ও অন্যান্য অনেকের শিক্ষার ধারা পরিবর্তন করে আমি সুফল পেয়েছি বলে মনে করি। উন্মত্তবৎ পদ ও মর্যাদার

পশ্চাদ্ধাবন করার জন্য বহু পরিবার ধ্বংস হয়ে গেছে ও সুনীতির পথ ছেড়েছে। সন্তান-সন্ততিকে শিক্ষাদানের অর্থ সংগ্রহের জন্য পিতাকে কি জাতীয় সন্দেহজনক কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়, তা কে না জানে? আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না করলে আমাদের আরও গভীর দুর্দিনের জন্য প্রস্তুত হতে হবে। দেশের লক্ষ লক্ষ শিশুর এক অকিঞ্চিৎকর অংশকে আমরা শিক্ষার সোনার কাঠির ছোঁয়া দিতে পেরেছি। এদের অধিকাংশই শিক্ষা পায় না এবং তার কারণ তাদের অনিচ্ছা নয়। তাদের পিতামাতার জ্ঞান ও সঙ্গতির অভাবের জন্যই এরকম হয়। এর গোড়াতেই কোন গলদ আছে। বিশেষ আমাদের মত দরিদ্র জাতির পিতামাতাকে যদি এতগুলি বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রকন্যার ভরনপোষণ নির্বাহ করতে হয় ও পুত্রকন্যার কাছ থেকে অবিলম্বে কোনরকম আর্থিক প্রতিদান আশা না করে তাদের যদি এই ব্যয়বহুল শিক্ষা দিতে হয়, তাহলে সমগ্র বিষয়টি সম্বন্ধে গভীর ভাবে চিন্তার অবকাশ আছে বলে মনে হয়। শিক্ষার সূচনা থেকে ছাত্রছাত্রীরা এর ব্যয় নির্বাহের জন্য পরিশ্রম করলে আমি তার ভিতর কিছু অন্যায় দেখি না। সমগ্র ভারতের পক্ষে প্রয়োজনীয়, সকলের উপযোগী সহজতম হাতের কাজ হচ্ছে সুতা কাটা ও এর আনুষঙ্গিক পূর্বক্রিয়া। এই ক্রিয়া আমাদের শিক্ষায়তন সমূহে প্রবর্তিত হলে তিনটি উদ্দেশ্য সাধিত হবে: শিক্ষা স্বাবলম্বী হবে, বালক-বালিকাদের দেহ ও মনের অনুশীলন হবে, এবং বিদেশী বস্ত্র ও সুতা সম্পূর্ণ ভাবে বর্জন করার রাস্তা তৈরী হবে। এছাড়া এইভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছেলেমেয়েরা আত্মবিশ্বাসী ও স্বাধীনচেতা হয়ে বেরোবে। পত্রলেখককে আমি পরামর্শ দেব যে, পরিবার প্রতিপালনের জন্য পরিবারস্থ প্রত্যেককে তিনি যেন সুতা কেটে ও বস্ত্র বয়ন করে সাহায্য করতে বলেন। আমার পরিকল্পনা হচ্ছে এই যে নির্ধারিত ন্যূনতম পরিমাণ সুতা না কাটলে কোন শিশুর শিক্ষা পাবার অধিকার থাকবে না। এইরকম পরিবার এমন আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার স্বাদ পাবেন, যা ছিল ইতিপূর্বে স্বপ্নাতীত। এ পরিকল্পনা ব্যাপক শিক্ষা প্রসারের বাধক নয়, বরং শিক্ষাকে এর দ্বারা প্রত্যেকটি ছেলেমেয়ের আয়ত্বের মধ্যে এনে দেয়। এর ফলে সাহিত্য কেন্দ্রিক শিক্ষার পূর্বতন গৌরব পুঃনপ্রতিষ্ঠিত হয়; কারণ এ পদ্ধতিতে সাহিত্য চর্চা হয় মূলতঃ মানসিক ও নৈতিক সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যম। জীবিকার সাধন হিসেবে এর স্থান এর পরে আসে এবং তাও গৌণভাবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৫-৬-১৯২১

১১। স্বরাজের দৃষ্টিতে জাতীয় শিক্ষা *

শিক্ষা সম্বন্ধে আমার দৃষ্টি অতীব বৈপ্লবিক এবং এইজন্য আমার সমালচোকদের কাছে এ একেবারে কিম্ভূতকিমাকার। আমি শুধু স্বরাজের দৃষ্টিকোণ থেকেই জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করতে পারি। সুতরাং আমি চাইব যে কলেজের ছাত্রছাত্রীরা যেন সুতা কাটা ও তাব আনুষঙ্গিক ক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে শেখার জন্য মনোযোগ দেয়। আমি চাই যে তারা খাদির অর্থশাস্ত্র ও তৎসংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করুক। একটি কাপড়ের কল স্থাপন করতে কত পুঁজি ও সময় লাগে তা তারা জানুক। কাপড়ের কলের অনির্দিষ্ট সম্প্রসারণের সম্ভাবনার সীমা কোথায় এও তারা জানুক। ফলে কাপড় তৈরী হলে কিভাবে সম্পদ বণ্টিত হয়, আর হাতে সুতা কেটে তাঁতে বুনে নিলেই বা সম্পদের বণ্টন কেমন ভাবে হয়, তা তাদের জানা প্রয়োজন। সুতা কাটার কল এবং ভারতীয় বস্ত্রশিল্প কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছিল সে সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান থাকা চাই। ভারতেব লক্ষ লক্ষ কৃষকের কুটীরে হাতে সুতা কাটা সুরু হলে তার ফল কি হবে, তা তাদের বুঝে দেখতে হবে, এবং হাতে কলমে এ কবেও দেখাতে হবে। পূর্ণমাত্রায় এই কুটীর শিল্পের পুনরভ্যুত্থান হলে হিন্দু ও মুসলমানের হৃদয়কে এ কেমন ভাবে এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে গ্রথিত করবে এ তথ্য তাদের জানা চাই। কিন্তু এসব কল্পনা হয় বিগত কালের, আর নয় আগামীকালের। এ আদর্শ এ যুগের আগেকার বা পরের যাই হোক না কেন, তার জন্য চিন্তা নেই। আমি শুধু এইটুকু জানি যে কোন না কোনদিন ভারতের প্রত্যেকটি শিক্ষিত ব্যক্তি এ পথ গ্রহণ করবেন।

১২। ভাবনগরের বক্তৃতা †

ছাত্রদের ধর্ম বা কর্তব্য সম্বন্ধে আজ আমাকে বলতে হবে। ধর্ম যতটা সহজ ততটাই আবার কঠিন। হিন্দুমতে ছাত্র হচ্ছে ব্রহ্মচারী এবং ছাত্রাবস্থা ব্রহ্মচর্যাশ্রম। কৌমার্য ব্রত পালন করা ব্রহ্মচর্যের সংকীর্ণ অর্থ। এর মূল অর্থ হচ্ছে ছাত্রাবস্থা

* অমৃতসরের পাঞ্জাব জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের ভাষণ থেকে।

† ভাবনগরের শ্যামলদাস কলেজের ছাত্রদের নিকট প্রদত্ত বক্তৃতা।

বা ছাত্রের জীবন। এর অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয় সংযম। সংযতেন্দ্রিয় হয়ে সমগ্র অধ্যয়নকালে জ্ঞানার্জন করার নামই ব্রহ্মচর্য। জীবনের এইভাগে প্রতিগ্রহের পরিমাণ বেশী, দান অল্প। এ সময় আমরা মূলতঃ গ্রহীতা। পিতামাতা, অধ্যাপকবর্গ এবং এই বিশ্বের কাছ থেকে যা পাই গ্রহণ করি। কিন্তু গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এখনই যদি প্রতিদানের দায়িত্ব না থাকে, (আর তা নেইও) তাহলে স্বভাবতই ভবিষ্যতে সময় এলে এ ঋণ চক্রবৃদ্ধি সুদসহ পরিশোধ করতে হবে। এই কারণেই হিন্দুরা ধর্মীয় কর্তব্যবোধ দ্বারা চালিত হয়ে ব্রহ্মচর্যাশ্রম পালন করেন।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টি থেকে ব্রহ্মচারী ও সন্ন্যাসীর জীবন সমঅর্থ সূচক। ব্রহ্মচারীকে ব্রহ্মচারী হতে হলে সন্ন্যাসী হতেই হবে। সন্ন্যাসীর কাছে এটা অভিরুচির প্রশ্ন। হিন্দুধর্মের চতুর্বিধ আশ্রমের আজ আর সে পবিত্র মর্যাদা নেই। থাকলে, এর শুধু আজ নামটুকুই আছে। অঙ্কুরেই ছাত্র ব্রহ্মচারীর জীবনকে বিষাক্ত করে দেওয়া হয়। সেই প্রাচীন আশ্রম প্রথার আজ অবশ্য এমন কিছু অবশিষ্ট নেই, যা বর্তমান যুগের যুবক-যুবতীদের সামনে অনুকরণ ও অনুসরণ যোগ্য আদর্শরূপে তুলে ধরা যেতে পারে। তথাপি সে যুগে যে মূল উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে আশ্রম ব্যবস্থার জন্ম হয়েছিল তার পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

এযুগে ছাত্রদের কর্তব্য জানার উপায় কি ? আদর্শ থেকে আমরা অনেক দূরে সরে গেছি। ছাত্রদের ভ্রান্তপথে পরিচালিত করার নেতৃত্ব নেন পিতামাতা। তাঁরা মনে করেন যে তাঁদের সন্তানকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্য হচ্ছে তার সামনে অর্থ ও প্রতিপত্তি অর্জনের পথ খুলে দেওয়া। এইভাবে শিক্ষা ও জ্ঞানের ব্যভিচার চলছে এবং বৃথাই আমরা ছাত্রজীবনের শান্তি, সারল্য, মাধুর্য খুঁজে বেড়াচ্ছি। যে সময় আমাদের ছাত্র সম্প্রদায়ের কোন কারণেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কথা নয়, সে সময় চিন্তা-ভাবনার ভারে তারা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছে। অধ্যয়নকাল তাদের কাছে শুধু গ্রহণ ও সাধিত বিষয় নিজের করে নেবার সময়। তারা এ সময় শুধু গ্রহণীয় আর বর্জনীয়ের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে শিখবে। শিক্ষকদের কর্তব্য হচ্ছে ছাত্রকে এইভাবে পার্থক্য করতে শেখানো। নির্বিচারে আমরা যদি সব গ্রহণ করে চলি তাহলে আমরা যন্ত্রের চেয়ে উঁচুদরের কিছু হব না। আমরা চিন্তাশীল এবং বুদ্ধিমান জীব। সেইজন্য এই সময়ে সত্য ও অসত্য, মিষ্ট ও রূঢ় ভাষা, পবিত্র ও অপবিত্র জিনিসআদির মধ্যে পার্থক্য করতে শিখব। কিন্তু ছাত্রদের চলার পথ আজকে শুধু ভালমন্দ বিচার করার চেয়ে অনেক কঠিন দায়িত্বে পূর্ণ। আজকের ছাত্রদের বিরুদ্ধ পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। ঋষি-গুরুর আশ্রমের পূত পরিবেশের পরিবর্তে আজ তারা শতধাবিচ্ছিন্ন গৃহ ও আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি

সঞ্জাত কৃত্রিম পরিবেশদ্বারা পরিবেষ্টিত। ঋষিরা বই ছাড়াই ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। ঋষিরা ছাত্রদের কয়েকটি মন্ত্র দিতেন এবং ছাত্ররা সেগুলিকে বহু মূল্যবান জ্ঞানে অন্তরে ধারণ করে বাস্তব জীবনে তদনুযায়ী চলার চেষ্টা করত। আজকের ছাত্রদের এত বিপুল সংখ্যক পুস্তকের মধ্যে থাকতে হয় যে সেগুলি তার শ্বাসরোধ করার পক্ষে যথেষ্ট। আমাদের কালে ছাত্রমহলে "রেনল্ডসের" লেখা খুব জনপ্রিয় ছিল ; কিন্তু আমি ভাল ছেলের ধার ঘেঁষেও না যাওয়ায় স্কুলপাঠ্য বইএর বাইরে তাকাইনি। তবে ইংলণ্ডে যেয়ে দেখলাম যে ভদ্রসমাজে এসব উপন্যাস অস্পৃশ্য এবং ওসব না পড়ে আমার কোন লোকসান হয়নি। এইরকম আরও অনেক ব্যাপার আছে যা ছাত্রবা অক্লেশে বাতিল করতে পারে। এই জাতীয় একটি ব্যাপাব হচ্ছে নিজ ভবিষ্যৎ গড়ার অশোভন ব্যগ্রতা। এ সম্বন্ধে ভাববে গৃহস্থ। ব্রহ্মচারী ছাত্রের ধর্ম এ নয়। তাকে নিজ দেশের অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে, সামনে যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ, তার ব্যাপকতা তাকে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে তার দায়িত্ব সম্বন্ধে তাকে অবহিত হতে হবে। আমার মনে হয় তোমাদেব মধ্যে কেউ কেউ সংবাদপত্র পড। এ অভ্যাস একেবারে ত্যাগ করতে বলা আমার উচিত নয় বলে আমি মনে করি। তবে স্বল্পকালীন গুরুত্বের সব কিছু যাতে তোমরা না পড় সে কথা আমি তোমাদের বলব এবং আমার মনে হয় সংবাদপত্রে স্থায়ী গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ কিছু থাকে না। চরিত্র গঠনের উপাদান এতে কিছুই থাকে না। তবুও সংবাদপত্রের জন্য দেশবাসীর উন্মত্ততার বিষয়ে আমি জানি। এ এক করুণ আতঙ্কজনক অবস্থা।

চরকা অতীব নির্দোষ অথচ এত অধিকমাত্রায় মঙ্গলকারী ক্ষমতা রাখে বলে চরকার বাণী সর্বদা এবং সর্বত্র প্রচার করতে আমি ক্লান্তি বোধ করি না। চরকার বাণী হয়তো খুব রুচিকর মনে না হতে পারে, কিন্তু স্বাস্থ্যের পক্ষে হানিকারক। মুখরোচক মশলাযুক্ত খাদ্যের চেয়ে স্বাস্থ্যপ্রদ খাদ্য স্বাদিষ্ট নয়। সুতরাং গীতার একটি সুন্দর শ্লোকে প্রত্যেকটি বিচারশীল ব্যক্তিকে বলা হয়েছে যে প্রথমাবস্থায় বিস্বাদ অথচ পরিণামে অমরত্বপ্রসূ দ্রব্যই যেন তারা গ্রহণ করে। আজ চরকা এবং তা থেকে উৎপন্ন দ্রব্যকে এই আখ্যা দেওয়া যায়। অশান্ত চিত্তে শান্তিবারি সেচনকারী, পথভ্রান্ত ছাত্রজীবনকে কল্যাণস্পর্শে সঞ্জীবিত-করণক্ষম ও তাদের জীবনকে আধ্যাত্মিকতার পরশদায়ী শক্তির উৎস হচ্ছে সুতা কাটা এবং তাই এর চেয়ে বড় যজন আর নেই। বাস্তবের পূজারী এই যুগ অবিলম্বে ফললাভাকাঙ্ক্ষী বলে দেশকে আমি চরকার চেয়ে শ্রেয় কোন ব্যবস্থাপত্র দিতে পারি না, এমন কি গায়ত্রীর কথাও এখন তুলতে পারি না। গায়ত্রী মন্ত্র অবশ্য সানন্দে আমি তোমাদের

দেব ; কিন্তু তাতে অবিলম্বে কোন ফল লাভ হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিতে পারি না। পক্ষান্তরে আমি যে জিনিসটির কথা বলছি তা গ্রহণ করলে যুগপৎ মুখে ঈশ্বরের নাম এবং হাতে কাজ চলবে ও তোমরা অবিলম্বে এর দ্বাবা উপকৃত হবে। জনৈক ইংরেজ বন্ধু লিখেছেন যে তাঁর ইংবেজ সুলভ সাধারণ বিচার বুদ্ধি তাঁকে বলছে যে সুতাকাটা নিঃসন্দেহে একটি সুন্দব শখ। তাঁকে আমি বলি, "আপনাদের কাছে এ একটি সুন্দর অবসর বিনোদনের উপায় হতে পারে ; কিন্তু আমাদের কাছে এ কল্পতরু"। পশ্চিমের অনেক কিছু আমি পছন্দ করি না ; কিন্তু তাদের মধ্যে এমন অনেক গুণ আছে, যার প্রতি আমার অনুরাগ গোপন করতে পারি না। তাদের 'অবসর বিনোদন' সম্যক অর্থসূচক। সুদক্ষ শল্য চিকিৎসক কর্ণেল মেড্‌ডক নিজ কার্যে অসীম তৃপ্তি পেলেও সদাসর্বদা ঐ নিয়ে থাকতেন না। দু' ঘণ্টা তিনি বাগান কবার শখের জন্য ব্যয় করতেন এবং এই বাগান করা তাঁকে সাহস ও উদ্দীপনা দিত ও তাঁর জীবনকে রূপে রসে গন্ধে ভরে তুলত।

১৩। পিতামাতার দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠান

বঙ্গদেশ পবিভ্রমণকালে আমি এই মর্মে একটি আশ্চর্যজনক সংবাদ পেলাম যে একটি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা নিজ পিতামাতার ভরনপোষণ নির্বাহেব চেয়ে প্রতিষ্ঠানের ব্যয়নির্বাহ করা অধিকতর কাম্য মনে কবেন। শুনলাম, এতে আমার সম্মতি আছে বলে বলা হচ্ছে। এই পত্রিকায় আমি যদি এমন কিছু লিখে থাকি যাতে পাঠকদের পূর্বোক্ত ধারণা হতে পারে, তাহলে তার জন্য আমি ক্ষমা-প্রার্থী। এরকম কোন অপরাধ সম্বন্ধে আমি সচেতন নই। আমার সব কিছুর জন্য আমি পিতামাতার কাছে ঋণী। "শ্রাবন" তাঁর পিতামাতার প্রতি যেরূপ আচরণের জন্য প্রসিদ্ধিলাভ করেছেন, নিজ পিতামাতার প্রতিও আমি অনুরূপ ভাব পোষণ করি। সুতরাং পূর্বোক্ত সংবাদ শ্রবণ করার পর অতিকষ্টে আমাকে ক্রোধ দমন করতে হয়েছে। যে যুবকটি এ ব্যাপার করেছে সে ঘটনার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। কিন্তু আজকাল একটু উন্নাসিক মনোভাব প্রকাশ করা এবং নিজেদের নৈষ্ঠিক আদর্শবাদী মনে করা অনেক ছেলেমেয়েদের মধ্যে একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মতে বয়ঃপ্রাপ্ত পুত্রের প্রথম কর্তব্য হচ্ছে বৃদ্ধ অশক্ত পিতামাতার ব্যয় নির্বাহ করা। পিতামাতার স্বাচ্ছন্দ বিধানে অপারগ হলে তারা বিবাহ না করতে পারে। এই প্রাথমিক সর্ত পূর্ণ না হলে তাদের জনসেবার কাজ হাতে নেওয়া উচিত নয়। পিতামাতার

অন্নবস্ত্রের সংস্থান করার জন্য প্রয়োজন বিধায়ে তাদের উপবাস করতে হবে। তবে ছেলেরা অবশ্য একটি জিনিস করবে না এবং তা হচ্ছে এই যে, বিবেচনা শক্তি বিহীন ও অবুঝ পিতামাতার দাবীর কাছে নতি স্বীকার করবে না। অনেক পিতামাতা জীবন নির্বাহের জন্য নয়, অহেতুক আড়ম্বর অনুষ্ঠান বা কন্যার বিবাহের কারণে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় করার জন্য টাকা চান। আমার মতে জনসেবকদের কর্তব্য হচ্ছে সবিনয়ে এ দাবী প্রত্যাখ্যান করা। সত্যি কথা বলতে কি কোন সত্যকার জনসেবক উপবাসে কালাতিপাত করছেন, এমন ব্যাপার কখনও আমার চোখে পড়েনি। অনেককে আমি অভাবের মধ্যে কাটাতে দেখেছি। এমনও কয়েকজনকে দেখেছি, য'রা যা নেয় তার চেয়ে তাদের বেশী পাওয়া উচিত। তবে তাদের কাজ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকে যেমন তার মূল্য বুঝবে, তখন আর তাদের অভাব থাকবে না। দুঃখকষ্টের ভিতর দিয়ে মানুষ গড়ে ওঠে। এ হচ্ছে সুষ্ঠু বিকাশের নিদর্শন। প্রতিটি যুবক যদি প্রাচুর্যের মধ্যে মানুষ হয় এবং অভাবেব নাম যদি তারা না জানে, তাহলে চরম পরীক্ষার দিনে তারা অযোগ্য বলে সাব্যস্ত হবে। ত্যাগই আনন্দ।

সুতরাং জনসাধারণের চোখের উপর নিজের ত্যাগের নিশান তুলে ধরা অনুচিত। কয়েকজন কর্মী আমাকে বলে যে তারা যে কোন প্রকার ত্যাগ স্বীকারে বিচলিত নয়। জেরায় জানতে পারলাম যে তাদের ত্যাগের অর্থ হচ্ছে ভিক্ষাবৃত্তি অর্থাৎ চাঁদা তুলে খাওয়া। অনেক জনসেবক অবশ্য এভাবে কাটিয়েছেন; কিন্তু তার জন্য কেউ ত্যাগ করছেন বলে দাবী করেননি। বহু যুবক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা ছেড়েছে। এজন্য তারা অবশ্যই প্রশংসার্হ। তবে সবিনয়ে আমি এই কথাটি নিবেদন করব যে এক্ষেত্রেও অহেতুক প্রশস্তি বাচন করা হয়। আনন্দ অনুভব না করলে কোন ত্যাগের অর্থ নেই। ত্যাগ এবং বিরস বদন—এ দুটি একসাথে হয় না। ত্যাগের অর্থ 'পবিত্র করা।' ত্যাগের জন্য যে সহানুভূতি প্রার্থী তাকে মানবতার এক হতভাগ্য নিদর্শন বলতে হবে। বুদ্ধ যে সব কিছু ত্যাগ করতে পেরেছিলেন, তার কারণ হচ্ছে এই যে তাঁর এ ছাড়া উপায় ছিল না। তাঁর কাছে কিছুর স্বামীত্ব অর্থে আত্মপীড়ন। অর্থশালী হওয়া কষ্টকর ব্যাপার বলে লোকমান্য দরিদ্র রয়ে গেলেন। এনড্রুজ মাত্র দু'এক টাকা থাকাই বোঝা বলে মনে করেন এবং তাই দু'চারটাকা হাতে এসে গেলে সর্বদা তাকে বিদায় করার জন্য চেষ্টা করেন। সময় সময় তাঁকে আমি বলি যে এইজন্য তাঁর একজন অভিভাবক দরকার। ধৈর্য ধরে তিনি আমার কথা শোনেন এবং তারপর হাসেন। তবে তিনি যা করতেন তার ব্যতিক্রম করেন না। "ভারত মাতা" দেবীটি বড়ই

ভীষণা। "বেশ বাবা, বেশ। এবার হয়েছে।" বলার আগে তিনি আরও বহু যুবক-যুবতীর বলিদান গ্রহণ করবেন। স্বেচ্ছায় আত্মোৎসর্গকারীর দান তিনি নেবেন, আবার অনিচ্ছুকের কাছ থেকেও জোর করে আদায় করবেন। এযাবৎ আমরা "ত্যাগ ত্যাগ খেলা" করেছি। আসল আত্মত্যাগের দিন পরে আসছে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৫-৬-১৯২৫

১৪। একটি ছাত্রের প্রশ্ন

আমেরিকায় পাঠরত স্নাতকোত্তর পর্যায়ের জনৈক ছাত্র লিখছে:—"ভারতের দারিদ্র্য অপনোদনের জন্য ভারতের সম্পদাবলী নিয়োগের কথা যারা ভাবেন, আমি তাদের মধ্যে একজন। এদেশে এই ছয় বৎসর হল এসেছি। উদ্ভিদ রসায়ন নিয়ে আমি চর্চা করছি। ভারতের শিল্পোন্নতির গুরুত্ব সম্বন্ধে এইরকম গভীর ভাবে বিশ্বাস না করলে আমি হয়তো সরকারী চাকরি নিতাম, আর নয় চিকিৎসা-বিদ্যা অধ্যয়ন করতাম।...আমার কাগজের খণ্ড বা কাগজ উৎপাদনের মত শিল্পে যোগদান করা কি আপনি সমর্থন করেন? ভারতের জন্য একটি সুবিবেচনা প্রসূত মানবতাপূর্ণ শিল্পোন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্বন্ধে সাধারণভাবে আপনার কি অভিমত? আপনি কি বৈজ্ঞানিক প্রগতি চান? বৈজ্ঞানিক প্রগতি বলতে আমি অবশ্য ফ্রান্সের ডাঃ পাস্তুর, টোবিয়োণ্টার ডাঃ বেণ্টিং এর গবেষণার মত মানব-কল্যাণকর আবিষ্কার বুঝি।"

সব জায়গার ছাত্রদের কাছ থেকে আমার কাছে এত প্রশ্ন আসে এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় আমার অভিমত সম্বন্ধে এত ভুল ধারণা আছে যে এই প্রশ্নটির প্রকাশ্য উত্তর দেওয়া আমি সমীচীন বোধ করছি। ছাত্রটি যে ধরণের শিল্পোন্নয়নের কথা ভাবছে তাতে আমার কোনরকম আপত্তি নেই। তবে এর জন্যই একে আমি মানবতাপূর্ণ বলব না। আমার কাছে ভারতের পক্ষে মানবতাপূর্ণ শিল্পোন্নয়নের পরিকল্পনা হচ্ছে হাতে সুতাকাটার গৌরবজনক পুনরভ্যুত্থান। কারণ শুধু এর দ্বারাই যে দারিদ্র্য এদেশের কোটী কোটী পর্ণকুটিরের অধিবাসীর জীবনকে কীটদষ্ট ফুলের মত নষ্ট করছে, অবিলম্বে তা দূর হতে পারে। দেশের উৎপাদিকা-শক্তি বৃদ্ধি করার জন্য আর সব এরপরে করা যেতে পারে। সুতরাং নিজের চরকাকে ভারতের কুটীরসমূহের পক্ষে উৎপাদনের অধিকতর কার্যকুশল যন্ত্রে পরিণত করার জন্য বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রত্যেকটি যুবক স্বীয় প্রতিভা নিয়োগ করুক এই আমি চাই। আমি বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিরুদ্ধবাদী নই। পক্ষান্তরে পশ্চিমের

বৈজ্ঞানিক মনোভাব আমার সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তবে আমার প্রশস্তিবাচন যদি কোথাও সীমীত হয়ে থাকে তবে তার কারণ হচ্ছে এই যে, পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা ঈশ্বরের ক্ষুদ্রতর সৃষ্টির প্রতি দৃকপাত করেন না। জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ প্রথা আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করি। তথাকথিত বিজ্ঞান ও মানবতার নামে নিরীহ জীবহত্যা করাকে আমি ক্ষমার অযোগ্য মনে করি এবং এর প্রতি বিরাগ পোষণ করি। নিরাপরাধের রক্তরঞ্জিত প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে আমি অহেতুক বিবেচনা করি। জীবন্ত ব্যবচ্ছেদ ছাড়া যদি রক্তসঞ্চালন সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন সম্ভব না হয়, তবে এমন জ্ঞান ছাড়াই মানুষের চলবে। আমার মনে হয় সেদিন দূরে নয়, যেদিন ইউরোপের সৎ বৈজ্ঞানিকরা জ্ঞানার্জনের বর্তমান উপায়ের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করবেন। মানবতার ভবিষ্যৎ মূল্যমান শুধু মানব সম্প্রদায়ের কথাই ভাববে না, ভবিষ্যতে সকল জীবের কথাই বিবেচনা করা হবে। আজ যেমন আমরা ধীর অথচ নিশ্চিত ভাবেই একথা উপলব্ধি করছি যে আমাদের এক-পঞ্চমাংশকে নরক সদৃশ অবস্থায় ফেলে রেখে হিন্দুত্বের বিকাশ অসম্ভব, অথবা প্রাচ্য দেশ ও আফ্রিকার জাতিসমূহকে শোষণ ও হতমান করে যেমন পাশ্চাত্য জাতির অস্তিত্ব বজায় রাখা ও সমৃদ্ধি হওয়া অসম্ভব, তেমনি সময়কালে আমরা বুঝতে পারব যে, সৃষ্টির নিম্নস্তরের জীবের চেয়ে আমরা উচ্চ পর্যায়ের বলে তাদের হত্যা করাতে আমাদের মহত্ব নেই, বরং আমাদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের মঙ্গল বিধানই আমাদের উচ্চতার নিদর্শন। কারণ এবিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয় যে, আমারই মত তাদের আত্মা বিদ্যমান।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৭-১২-১৯২৫

১৫। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বাণী *

সংখ্যা গৌরবে উল্লসিত হয় ভীরু। শৌর্যবানের গৌরব একক সংগ্রামে এবং তোমরা সকলে সেই শৌর্যের মন্ত্রে দীক্ষা নিতে এসেছ। তোমরা এক বা একাধিক যাই হও না কেন, মনের এই সাহসিকতাই হচ্ছে আসল বীরত্ব এবং আর সব কিছু মিথ্যা। আর ত্যাগ, দৃঢ়তা, বিশ্বাস ও বিনয় ছাড়া মনের এই সাহসিকতা অর্জন করা যায় না।

আত্মশুদ্ধির ভিত্তিতে আমরা এই বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেছি। অহিংস

* ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুন আহমেদাবাদের গুজরাট মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র সমাবেশে পঠিত ভাষণ। ঐ দিন গান্ধীজীর মৌনব্রত ছিল।

অসহযোগ এর একটি অঙ্গ। অহিংস ও অসহযোগের এই "অ"-এর অর্থ হচ্ছে হিংসা ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল কিছু অর্থাৎ সরকারী নিয়ন্ত্রণের সঙ্গেও সম্পর্কচ্ছেদ। তবে যতদিন না আমরা 'অস্পৃশ্য' ভাইদের সঙ্গে সহযোগিতা করি, যতদিন না বিভিন্ন ধর্মমতাবলম্বী ব্যক্তিদের ভিতর হৃদয়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যতদিন না দেশের জনগণের সুমহান মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার্থ আমরা চরকা ও খদ্দরকে জীবনের অঙ্গীভূত করে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করি, ততদিন এই নঙর্থক পূর্ব সংযোজনাটি সম্পূর্ণরূপে অহেতুক। সে অসহযোগ অহিংসা-ভিত্তিক না হয়ে ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত হবে। গঠণমূলক নির্দেশ ছাড়া শুধু নেতিবাচক বিধান হচ্ছে প্রাণহীন দেহেব মত এবং অগ্নিতে অর্পণ করাই হচ্ছে এর সদুপযোগ। ভারতের সাত লক্ষ গ্রামেব জন্য সাত হাজার রেলওয়ে স্টেশন বিদ্যমান। এই সাত হাজার জনপদকেও আমরা চিনি বলে দাবী করতে পারি না। রেল স্টেশন থেকে দূরে অবস্থিত গ্রামগুলি সম্বন্ধে আমরা শুধু ইতিহাস বই থেকে সংবাদ পেয়ে থাকি। এইসব গ্রামেব অধিবাসীদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ-সাধনকারী একমাত্র প্রেমবন্ধন হচ্ছে চরকা। এই মৌলিক সত্য যারা এখনও বোঝে নি, তাদের এখানে থাকা নিরর্থক হয়েছে। যে শিক্ষা ভারতের এই কোটী কোটী বুভুক্ষু জনতার অবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা কবে না ও এদের অবস্থার উন্নতির জন্য সচেষ্ট করে না, তাকে "জাতীয়" আখ্যা দেওয়া চলতে পারে না। কর সংগ্রহের পর সরকাবের সঙ্গে গ্রামের আর সম্পর্ক থাকে না। তাদের সঙ্গে আমাদেব যোগাযোগের সূত্রপাত হয় চরকার দ্বারা তাদের সেবার সূচনায়। তবে সেখানেই কিন্তু তার পরিসমাপ্তি নয়। চরকা হচ্ছে এই সেবাকার্যের কেন্দ্রবিন্দু। তোমাদের আগামী অবকাশ যদি কোন সুদূর গ্রামে কাটাও তবে আমার কথার যথার্থতা বুঝতে পারবে। দেখবে যে সেখানকার অধিবাসীরা নিরানন্দ ও ভয়ভীত। বহু ঘর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে দেখবে। বৃথাই তোমরা কোনরকম স্বাস্থ্যরক্ষা বা ময়লা পরিষ্কারের ব্যবস্থা আছে কিনা খুঁজে বেড়াবে। পশুগুলির অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থা দেখবে ; কিন্তু তবুও সেখানে দৃঢ়মূল আলস্য চোখে পড়বে। লোকে তোমাদের জানাবে যে বহুদিন আগে ঘরে ঘরে চরকা ছিল ; তবে আজ তারা চরকা বা অন্য কোন কুটীরশিল্প সম্বন্ধে আগ্রহ প্রকাশ করবে না। তাদের ভিতর আশার লেশমাত্র অবশিষ্ট নেই। ইচ্ছা করলেই মরা যায় না বলে তারা বেঁচে আছে। তোমরা যদি সুতা কাট, তাহলেই তারা সুতা কাটা ধরবে। ৩০০ জন অধ্যুষিত কোন গ্রামের ১০০ জনও যদি সুতা কাটে তাহ'লে তারা যে বার্ষিক ১৮০০৲ টাকা রোজগার করতে পারে, এটা তাদের দেখিয়ে দিতে হবে। প্রত্যেকটি গ্রামে এই অতিরিক্ত উপার্জনের ভিত্তিতে গ্রাম

সংস্কারের স্থায়ী বনিয়াদ স্থাপিত হতে পারে। আমি জানি যে একথা বলা সহজ, কিন্তু করে দেখানো খুব কঠিন। বিশ্বাস থাকলে একাজ সহজে হতে পারে। মোহ আমাদের কানে কানে বলবে, 'আমি একা হাতে সাত লক্ষ গ্রামে কি করতে পারি ?' এই বিশ্বাস নিয়ে কাজ সুরু কর যে একটি মাত্র গ্রামে কাজ সুরু করে সফল হলে বাদবাকী সব আপনি হবে। তাহলে প্রগতি সম্বন্ধে চিন্তার কোন কারণ থাকবে না। এই বিদ্যালয় তোমাদের ঐ জাতীয় কর্মীরূপে গডতে চায়। একাজে যদি আনন্দ না থাকে তাহলে নিঃসন্দেহে এ বিদ্যালয় আনন্দবিহীন এবং একে ছেড়ে যাওয়া উচিত।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৭-৬-১৯২৬

১৬। আত্মত্যাগ

আমার সামনে একাধিক যুবকের নিকট হতে প্রাপ্ত এমন সব পত্র রয়েছে যার লেখকরা অভিযোগ করেছে যে জনসেবার ক্ষেত্রে তারা যে মাসোহারা পায় তা তাদের পারিবারিক প্রয়োজন মিটাবার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। একজন সেই-জন্য বলেছে যে, সে জনসেবার কাজ ছেড়ে দিয়ে ধার করে বা চেয়েচিন্তে কিছু টাকা জোগাড় করে ইউরোপে গিয়ে তার উপার্জন-ক্ষমতা বাড়াবে। আর একজন বেশী মাইনের চাকরি খুঁজছে এবং অন্য একজন আবার কোন লাভজনক ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ কবার জন্য কিছু পুঁজি চেয়েছে। এইসব যুবকদের মধ্যে প্রত্যেকেই খাঁটি, সৎ এবং আত্মত্যাগী কর্মী। কিন্তু এদের মধ্যে এক প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। পারিবারিক প্রয়োজন বেড়ে গেছে। খাদি বা জাতীয় শিক্ষায় তাদের অন্তর তৃপ্ত নয়। আরও টাকা চেয়ে তারা জনসেবা কার্যের বোঝা হতে চায় না। কিন্তু এই মনোভাব সর্বদা ব্যাপক হলে এর ন্যায়সঙ্গত পরিণতি হচ্ছে—হয় যেসব জনসেবা-মূলক কাজে এই জাতীয় যুবক-যুবতীর সেবা প্রয়োজন, সেসব বন্ধ করে দেওয়া, অথবা এইসব কর্মীদের মাসোহারা একধার থেকে অনির্দিষ্ট ভাবে বাড়িয়ে যাওয়া এবং এর ফলেও এই একই রকম অবাঞ্ছিত পরিণতিতে পৌছাতে হবে।

আমাদের পরিবেশের সঙ্গে তাল দিয়ে এইভাবে আমাদের প্রয়োজন ক্রমাগত দ্রুতহারে বেড়ে চলে—এই তথ্য জানার পর অসহযোগের কল্পনা মাথায় আসে। এইভাবে যে অসহযোগ আন্দোলনের কল্পনার উদ্রেক হয়, তা কিন্তু কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে নয়। যে পদ্ধতি আমাদের তার সর্পিল আলিঙ্গনে জড়িয়ে চূর্ণবিচূর্ণ করার ব্যবস্থা করেছে, এ অসহযোগ সেই মনোভাবের বিরুদ্ধে। দেশের সর্বসাধারণের

অবস্থার প্রতি বিন্দুমাত্র দৃকপাত না করে এই পদ্ধতি আমাদের জীবনমান উন্নত করতে কৃতকার্য হয়েছে। আর ভারত অন্যদেশের শোষণের উপর নির্ভরশীল নয় বলে দেশের মধ্যবিত্ত অর্থাৎ মধ্যসত্বভোগীদের বিকাশের অর্থ দাঁড়িয়েছে সর্ব নিম্নশ্রেণীর বিলুপ্তি। সুতরাং ক্ষুদ্রতম পল্লীটিও অতি পরিশ্রমের চাপে মরণোন্মুখ। ১৯২০ খৃষ্টাব্দেই আমাদের অনেকের কাছে একথা স্পষ্ট ধরা পড়েছিল। এ আন্দোলনের এখন শৈশবাবস্থা। হঠাৎ কোন কিছু করে এ আন্দোলনের পথে বাধক হওয়া উচিত নয়।

পাশ্চাত্য প্রথায় যৌথ পরিবারেব স্থান নেই বলে আমাদের এই কৃত্রিম প্রয়োজন বৃদ্ধি বড় বেশী করে অনুভূত হচ্ছে। যৌথ পরিবার প্রথা প্রাচীন হবাব সঙ্গে সঙ্গে এর ত্রুটীগুলি বড় রূঢ়ভাবে দেখা দিচ্ছে এবং এর যাবতীয় মাধুর্য অদৃশ্য হয়ে গেছে। এইভাবে দোষেব উপর দোষ বাড়ছে।

সুতরাং আমাদের আত্মত্যাগ হবে দেশের প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে। বাইরে থেকে ভিতরের সংস্কারেব প্রয়োজন অধিক। গলিত আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপব বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া আদর্শ শাসনতন্ত্র হবে বোঝার উপর শাকের আঁটির মত।

অতএব আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত বিকাশ করতে হবে। আত্মত্যাগ বৃত্তির সম্প্রসারণ করতে হবে। অতীতের ত্যাগ মহান হলেও দেশমাতৃকার বেদীমূলে যে ডালি দেওয়া প্রয়োজন তার তুলনায় এযাবৎ কিছুই হয়নি। পরিবারের মধ্যে যিনি সুস্থ হয়েও কাজ করবেন না, তাঁকে দেখা আমাদের কর্তব্য নয়। এ ব্যাপাবে নর বা নারীর পার্থক্য করার প্রয়োজন নেই। সামাজিক ভোজ বা ব্যয়বহুল বিবাহের অনুষ্ঠানাদি নিরর্থক ও অজ্ঞতাপ্রসূত প্রথার জন্য আমাদের এক কপর্দক ব্যয় করা উচিত হবে না। প্রতিটি বিবাহ ও মৃত্যু পরিবারের প্রধানের উপর অহেতুক এক নিষ্ঠুর বোঝার মত চেপে বসে। এসব কাজকে আমরা আত্মত্যাগ ও আত্মসুখ বর্জনের দৃষ্টান্ত বলে মানব না। দৃঢ়তা ও সাহসিকতা সহকারে এসব পাপের সম্মুখীন হতে হবে।

এরপর আবার আমাদের অতীব ব্যয়বহুল শিক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে। লক্ষ লক্ষ লোকের যখন দিন চালানো দায় এবং হাজার হাজার লোক যখন অনশনে মৃত্যুবরণ করছে, তখন নিজের আত্মীয়-স্বজনকে ব্যয়বহুল শিক্ষা দেবার কথা চিন্তা করাও পাপ। অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গে মনের বিকাশ ঘটবে। এর জন্য স্কুল বা কলেজের চার দেওয়ালের মধ্যে আটক থাকার দরকার নেই। আমাদের মধ্যে জনকয়েক যখন এই তথাকথিত উচ্চশিক্ষাকে অগ্রাহ্য করবে, তখন খাঁটি উচ্চশিক্ষা দেওয়া ও

নেওয়ার উপায় আবিষ্কৃত হবে। ছাত্রদের পক্ষে নিজ শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের উপায় নেই, না খুঁজে পাওয়া যায় না? হয়তো এরকম কোন উপায় নেই। এরকম উপায় আছে কি নেই সেকথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আমরা যখন দেখব যে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা অতীব কাম্য, অথচ ব্যয়বহুল শিক্ষার শরণ নিতে আমরা রাজি নই, তখন অধিকতর মাত্রায় আমাদের পরিবেশের অনুকূল উচ্চশিক্ষা পাবার এবার একটি উপায় আবিষ্কৃত হবে। এসব ক্ষেত্রে সেরা নীতি হচ্ছে লক্ষ লক্ষ লোক যা পায় না তা নিতে অস্বীকার করা। এই অস্বীকার করাব শক্তি অকস্মাৎ আমাদের মধ্যে উদিত হবে না। এর জন্য প্রথমে লক্ষ লক্ষ লোক যে সুযোগ-সুবিধা পায় না তা নিতে অস্বীকার করার মত চিত্তবৃত্তির অনুশীলন দরকার এবং তারপর অবিলম্বে আমাদের জীবনকে এই আদর্শ অনুযায়ী পুনর্গঠিত করা দবকার।

আমার মতে এই জাতীয় এক বিশাল, অতি বিশাল আত্মোৎসর্গকাবী দৃঢ়চেতা কর্মীবাহিনী বিনা জনগণের সত্যকার প্রগতি অসম্ভব এবং সেই বকম প্রগতি বিনা স্বরাজ বলে কোন কিছু পাওয়া যাবে না। দরিদ্রদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগে উদ্বুদ্ধ কর্মীর সংখ্যা ঠিক যতটা বৃদ্ধি পাবে, আমাদের স্বরাজাভিমুখী প্রগতিও সেই অনুপাতে বাড়বে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৪-৬-১৯২৬

১৭। "মহাত্মাজীর নির্দেশ"

জনৈক শিক্ষক লিখছেন :—

"আমাদের স্কুলে অল্প কয়েকজন ছেলের একটি দল আছে যারা মাসকয়েক যাবৎ নিয়মিত ভাবে অখিল ভারত চরকা সঙ্ঘকে নিজ হাতে কাটা ১০০০ গজ করে সুতা পাঠাচ্ছে এবং আপনার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবশতঃ তারা এই যৎসামান্য সেবা-কার্য করে থাকে। কেউ তাদের সুতা কাটার কারণ জিজ্ঞাসা করলে ছাত্ররা জবাব দেয়, 'মহাত্মাজীর নির্দেশ এটা, এ মানতেই হবে।' আমার মতে ছোট ছোট ছেলের এরকম মনোভাবকে সর্ববিধ উপায়ে প্রোৎসহিত করা উচিত। দাসত্ব মনোবৃত্তি এবং বীরপুজা বা গভীর আনুগত্যের মধ্যে আকাশ পাতালের পার্থক্য। এইসব ছেলেরা আপনার হাতের প্রেরণাদায়ী আশীর্বাণী পেতে উদগ্রীব। এদের অনুরোধ আপনি রক্ষা করবেন, এবিষয়ে আমি দৃঢ়নিশ্চয়।"

এই চিঠিতে যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তা বীরপুজা না অন্ধ অনুকরণ তা

আমি বলতে পারি না। আমি মানি যে এমন অনেক সময় আসে যখন যুক্তির জন্য অপেক্ষা না করে গভীর আনুগত্যের প্রয়োজন ঘটে। নিঃসংশয়েই একে সৈনিকোচিতো গুণ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। আর দেশের বহুল সংখ্যক অধিবাসীর এগুণ না থাকলে জাতির পক্ষে প্রভূত পরিমাণে অগ্রগতি করা সম্ভব নয়। কিন্তু কোন সুসংবদ্ধ সমাজে এজাতীয় আনুগত্য প্রকাশের অবকাশ আসে কদাচিৎ এবং এ রকম অবকাশ বেশী আসা উচিতও নয়। কোন বিদ্যালয়ের ছাত্র-দের পক্ষে সর্বাপেক্ষা হীন অবস্থা যা আমি কল্পনা করতে পারি, তা হচ্ছে শিক্ষকের প্রতিটি কথা অন্ধভাবে অনুসরণ করা। পক্ষান্তরে, শিক্ষকগণ যদি স্বীয় অধীনস্থ বালক-বালিকাদের মনের যুক্তিবাদকে বাড়িয়ে গেলেন, তাহলে ক্রমাগত তাদের বিবেচনা শক্তির চর্চা হবে ও তারা স্বয়ং ভাবতে শিখবে। যেখানে যুক্তিব অবসান, বিশ্বাসের সূত্রপাত সেখানে। কিন্তু বিশ্বে এমন ব্যাপার অতি অল্পই ঘটে যার যুক্তিসঙ্গ ত কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। কোন শিক্ষকের এমন অবস্থা বরদাস্ত করা উচিত নয়, যেখানে ছাত্রবা কুঁয়ার জলের বিশুদ্ধতার প্রতি সন্দেহের কারণ উদ্রেক হওয়ায় জল ফুটিয়ে খাচ্ছে অথচ এব কারণ জিজ্ঞাসা করায় জবাব দিচ্ছে যে এটা কোন এক মহাত্মার নির্দেশ। উপরিউক্ত ক্ষেত্রে ছাত্রদের উত্তর যদি সন্তোষজনক না হয়ে থাকে, তবে নিঃসন্দেহেই যে বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সুতা কাটার কারণ সম্বন্ধে ঐ রকম জবাব দিয়েছে, তাদের উত্তরও অনুমোদন যোগ্য নয়। ঐ বিদ্যালয় থেকে আমার মহাত্মাগিরি যখন ছুটে যাবে (আমি ভালভাবেই জানি যে এরকম অনেক জায়গা থেকে আমার মহাত্মাগিরি ছুটে গেছে ; সেসব জায়গা থেকে অনেকে কৃপাপরবশ তাঁদের হৃত প্রীতির সংবাদ আমাকে জানিয়েছেন) তখন সেখানকাব চরকা নষ্ট হয়ে যাবে বলে আমার মনে আশঙ্কা বিদ্যমান। আদর্শ নিঃসন্দেহে ব্যক্তিব চেয়ে বড। চরকা নিশ্চয় আমার চেয়ে মহীয়ান। যখন আমি দেখব যে বাঁর বলে আমি যে পূজা পাচ্ছিলাম তা বন্ধ হযে যাবার দরুণ চরকার মত এক মহান আদর্শ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তখন আমি সাতিশয় দুঃখিত হব। কারণ আমি হয়তো কোন রকম মূঢ়তা সঞ্জাত ভুল করতে পারি বা কোন না কোন কারণে লোকে হয়তো আমার প্রতি বীতস্পৃহ হতে পারে। সুতরাং স্বয়ং ছাত্রদের দ্বারা এসব ব্যাপারের কারণ আবিষ্কৃত হওয়া সর্বোত্তম পন্থা। চরকার আদর্শ অবশ্যই যুক্তির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আমার মতে এর মধ্যে ভারতের সমগ্র মানব সম্প্রদায়ের কল্যাণ নিহিত। ছাত্ররা সেইজন্য জনগণের তীব্র দারিদ্র্য সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহ করবে। নিজের চোখে তারা এমন দুই একটি গ্রাম দেখবে, যা দারিদ্র্যের পেষণে চুরমার হয়ে পড়ছে। ভারতের জনসাধারণকে তারা চিনবে।

এই উপমহাদেশের সুবিপুল বিস্তৃতি সম্বন্ধে তাদের উপলব্ধি আসা চাই এবং একথা বোঝা চাই যে দেশের লক্ষ লক্ষ কোটী কোটী ব্যাক্তি তাদের যৎসামান্য সঙ্গতি বৃদ্ধির জন্য এই কাজটিই শুধু করতে পারে। এদেশের দীন ও দরিদ্রতম ব্যক্তির সঙ্গে তারা একাত্ম হতে শিখবে। দরিদ্রতম ব্যক্তিটি যেসব জিনিস পায় না, যথাসম্ভব সেসব বর্জন করার শিক্ষা তারা গ্রহণ করবে। তাহলে তারা সুতাকাটার মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করবে। তাহলেই আমার সম্বন্ধে মোহমুক্ত হওয়া বা ঐ জাতীয় আপাত-প্রাপ্তি সত্ত্বেও চরকা ঠিকমত চলবে। চরকার আদর্শ এত মহৎ ও এত মঙ্গলদায়ক যে এর জন্য শুধু বীরপূজার উপর নির্ভরশীল হবার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানসম্মত অর্থশাস্ত্রের উপর এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত।

আমি জানি যে পত্রলেখক যেরকম উদাহরণ পেশ করেছেন, দেশে এরকম অন্ধ বীরপূজার অপ্রতুলতা নেই। তবে আমি আশা করি যে জাতীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্প্রদায় আমি যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করলাম তার কথা স্মরণ রাখবেন এবং কোন ব্যক্তির যত সুখ্যাতিই হোক না কেন, ছাত্রদের কোন কাজকে অন্ধভাবে তাঁদের বক্তব্যের আধারে পরিচালিত হবার সুযোগ দেবেন না।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৪—৬—১৯২৬

১৮। প্রার্থনায় আস্থা নেই

একটি জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কাছে জনৈক ছাত্র প্রার্থনা সভায় উপস্থিতির হাত থেকে রেহাই চেয়ে যে পত্র লিখেছে তা উদ্ধৃত করছি :—

"ঈশ্বর বলে এমন কিছুর অস্তিত্ব আমি মানি না, যার কাছে প্রার্থনা করার প্রয়োজন আছে। সুতরাং আমার বিনীত নিবেদন এই যে আমার প্রার্থনায় আস্থা নেই। আমার কাছে ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন করার কোন প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। আমি যদি তাঁর প্রতি দৃকপাত না করে শান্ত সমাহিত চিত্তে নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করে চলি, তবে তাতে ক্ষতি কি?

সমবেত প্রার্থনার কথা বিবেচনা করলে মনে হয় যে এর কোন প্রয়োজন নেই। একত্র সমবেত এত বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির পক্ষে কি যতই নগণ্য বিষয় হোক না কেন, কোন ব্যাপারে মনঃসংযোগ করা সম্ভব? অপরিণত বয়স্ক ও অজ্ঞ শিশুর দল চপল চিত্তের প্রভাব কাটিয়ে আমাদের পুরাণাদিতে উক্ত ঈশ্বর, আত্মা, সকল জীবে সমভাব আদি উচ্চ কোটীর ভাবের প্রতি আকৃষ্ট হবে—এই কি আমরা আশা করি? এই আচারের অনুষ্ঠান হয় বিশেষ একটি মুহূর্তে বিশেষ এক

ব্যক্তির নির্দেশে। এইরূপ কোন যন্ত্রবৎ চালিত অনুষ্ঠানের দ্বারা কি ছেলেদের হৃদয়ে তথাকথিত প্রভুর প্রতি প্রেমভাব দৃঢ়মূল হতে পারে? সব রকম স্বভাবের মানুষের কাছ থেকে একই রকম ব্যবহার আশা করার চেয়ে অযৌক্তিক ব্যাপার আর কিছু হতে পারে না। সুতরাং প্রার্থনা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত নয়। যাদের অভিরুচি আছে, তারা প্রার্থনায় যোগদান করুক এবং যাদের আগ্রহ নেই তাদের ছেড়ে দেওয়া হোক। হৃদয়ে অবিশ্বাস নিয়ে যা কিছু করা যায়, তা দুর্নীতিপূর্ণ হীন কার্য।"

প্রথমে আমরা শেষের কথাটার মূল্য নির্ধারণের চেষ্টা করব। নিয়ম শৃঙ্খলার প্রয়োজন সম্বন্ধে পূর্ণরূপে উপলব্ধি করার আগে তা মেনে চলা কি দুর্নীতিমূলক বা হীন কাজ? বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়েব প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রতীতি জন্মাবার পূর্বে সে বিষয় অধ্যয়ন করা কি দুর্নীতি বা নীচ কার্য? তাহলে কোন ছেলে মাতৃভাষা পড়া নিষ্প্রোয়জন বোধ কবলে তাকে এব থেকে রেহাই দিতে হবে। তার চেয়ে এই কথাই কি অধিকতর সত্য নয় যে স্কুলের ছেলেদের কি শেখা উচিত এবং কি রকম নিয়ম শৃঙ্খলা পালন কবা দবকার—এ সম্বন্ধে কোন রকম বিশ্বাস অবিশ্বাসের বালাই নেই। যদি তার অভিরুচি বলে কিছু থেকেও থাকে, তবে কোন প্রতিষ্ঠানে যোগ দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কোন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করার অর্থ হচ্ছে স্বেচ্ছায় এর নিয়মকানুন মেনে চলা। সে অবশ্য ইচ্ছা করলে প্রতিষ্ঠ.নের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে পারে; কিন্তু কিভাবে কি শিখবে এ সম্বন্ধে তার কোন ইচ্ছা থাকতে পারে না।

আপাতদৃষ্টিতে ছাত্রদের যে বিষয় নীরস মনে হয় ও যার প্রতি তারা বিরূপ মনোভাব পোষণ করে, শিক্ষকের কর্তব্য হচ্ছে তাকে আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করে তোলা।

"ঈশ্বরে আমার বিশ্বাস নেই"—একথা বলা খুব সহজ। কারণ তিনি বিন্দুমাত্র আক্রোশ পোষণ না করে তাঁর সম্বন্ধে সব কিছু বলতে দেন। তিনি আমাদের কার্যকলাপের প্রতি চেয়ে থাকেন এবং তাঁর বিধানের বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হলে সাজা পেতে হয়। তবে এ শাস্তি প্রতিশোধমূলক নয়। আমাদের সংশোধনের জন্যই এ আঘাত। ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না এবং এ বিষয় প্রমাণ সাপেক্ষ নয়ও। তাঁকে যদি না অনুভব করতে পারি তবে আমাদের পক্ষে তা দুঃখের কথা। অনুভূতির অস্তিত্ব না থাকা একটা রোগ এবং কোন না কোনদিন আমরা স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় এ ব্যাধিমুক্ত হব।

কিন্তু ছাত্রের পক্ষে তর্ক নিষ্প্রোয়জন। যে প্রতিষ্ঠানের সে ছাত্র, সেখানে

যদি প্রার্থনা সভায় উপস্থিতি কাম্য হয়, তাহলে নিয়মানুবর্তিতার খাতিরে তাকে এটা করতে হবে। তবে নম্রভাবে সে তার সন্দেহের কথা শিক্ষক মহাশয়ের কর্ণগোচর করতে পারে। যে বিষয় তার মনে ধরেনি তা সে বিশ্বাস না করতে পারে। তবে শিক্ষকদেব প্রতি তার শ্রদ্ধা থাকলে তাকে যা বলা হবে, বিশ্বাস না থাকলেও তা সে করবে। তবে ভয়ে বা অসন্তুষ্ট অন্তরে সে এমন করবে না। একাজ তার করা উচিত এবং আজ যা তার কাছে অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে, কোন না কোনদিন তা পরিষ্কার হয়ে যাবে—এই মনোভাব নিয়ে সে সেই কাজ করবে।

কিছু চাওয়াকে প্রার্থনা বলে না। এ হচ্ছে অন্তরের কামনা। মানুষেব প্রাত্যহিক দুর্বলতা স্বীকার করাই প্রার্থনা। আমাদের মধ্যে মহাপরাক্রমশালীরও প্রতিনিয়ত একথা স্মরণ রাখা উচিত যে জরা, ব্যাধি, মৃত্যু ও দুর্ঘটনা আদির কাছে সে কিছু নয়। আমবা মরণেব মাঝে রয়েছি। চক্ষেব নিমিষে সব কিছু যখন শূন্যে বিলীন হতে প'রে বা এইভাবে আমাদের বিন্দুমাত্র প্রস্তুতির অবকাশ না দিয়ে তড়িৎবেগে যখন কর্মক্ষেত্র থেকে আমরা অপসারিত হতে পারি, তখন 'নিজ পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ কবার' আব কি অর্থ আছে? কিন্তু হৃদয় দিয়ে যদি আমরা অনুভব কবি যে আমরা 'ঈশ্বরের জন্য তাঁর নির্দিষ্ট পবিকল্পনা অনুযায়ী কাজ কবছি' তবে নিজেদেব পাথরেব মত শক্ত মনে হবে। তাহলে সবই দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে যাবে। সে অবস্থায় কোন কিছুরই বিনাশ নেই। যা কিছু লয় পেতে দেখি, তখন সবই মায়া মনে হবে। অনুভূতির সেই অবস্থাতেই শুধু মৃত্যু ও ধ্বংসের কোন অস্তিত্ব থাকবে না। কারণ সে অবস্থায় মরণ বা বিনাশ রূপান্তর ছাড়া আর কিছু নয়। আবও ভাল ছবি আঁকবে বলে শিল্পী তার ছবি নষ্ট করে। ঘড়ি-নির্মাতা খারাপ স্প্রিংটি ফেলে দিয়ে নূতন ও কার্যসাধনক্ষম স্প্রিং লাগায়।

সমবেত প্রার্থনা মহান ব্যাপার। অনেক সময় একা আমরা যে কাজ করি না, দলে পড়ে তা করে থাকি। ছেলেদের বিশ্বাসের দরকার নেই। অন্তরের বাধা মুক্ত অবস্থায় তারা শুধু নিয়মানুবর্তিতার খাতিরে যদি প্রার্থনার ঘণ্টি অনুযায়ী কাজ করে, তাহলেই তাদের মধ্যে উচ্চভাবের অনুভূতি আসবে। কিন্তু অনেকে এরকম করে না। তারা এমন কি খুনসুড়ি জুড়ে দেয়। তবে এর প্রচ্ছন্ন প্রভাব প্রতিরোধ করা যায় না। এমন অনেক ছেলে কি দেখা যায় না যে প্রথমাবস্থায় যারা সমবেত প্রার্থনার প্রতি বিদ্রূপ বাণী উচ্চারণ করত; কিন্তু পরে তারা এর উপকারিতার প্রচণ্ড সমর্থকে পরিণত হয়েছে? যেসব ব্যক্তির বিশ্বাসের জোর

অতীব তীব্র নয়, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে সাময়িক প্রার্থনায় তারা শান্তি পেয়েছে। মন্দির, মসজিদ আর গীর্জায় যারা আসে, তাদের ভিতর সবাই বিদ্রূপ-কারী বা ভণ্ড নয়। এরা সৎ নরনারী। তাদের কাছে সাময়িক প্রার্থনা নিত্য-স্নানের মত অস্তিত্ব রক্ষার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এইসব প্রার্থনা-স্থল দর্শনমাত্র অভিভূত হবার মত অন্ধ কুসংস্কারের কেন্দ্র নয়। এযাবৎ তারা প্রতিটি আক্রমণের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এবং মনে হয় অনন্তকাল ধরে তাই থাকবে।
ইয়ং ইণ্ডিয়া ২৩—৯—১৯২৬

১৯। শব্দের জুলুম

ইয়ং ইণ্ডিয়াতে ২৩শে সেপ্টেম্বরে প্রকাশিত আমার "প্রার্থনায় বিশ্বাস নেই" নামক প্রবন্ধটি সম্বন্ধে জনৈক পত্রলেখক লিখছেন :—

"আপনার পূর্বোক্ত প্রবন্ধে সেই ছেলেটির উপর বা একজন চিন্তানায়ক হিসাবে নিজের উপরও আপনি ন্যায়বিচার করেছেন বলে মনে হয় না। একথা সত্য যে সেই পত্রলেখক নিজ পত্রে যেসব শব্দ প্রয়োগ করেছে, তার সবগুলি মধুর নয় ; কিন্তু সে যে নিজের মনোভাব স্পষ্ট ভাবে জানিয়েছে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। ছেলে বলতে যা বোঝায় পত্রলেখক যে তা নয়, একথা স্পষ্ট বোঝা যায়। তার বয়স কুড়ির নীচে শুনলে আমি বিস্মিত হব। অল্পবয়স্ক হলেও ছেলেটি যথেষ্ট মানসিক অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছে এবং এই কারণে তার প্রতি 'ছেলেদের তর্ক করা অনুচিত' এই রকম মন্তব্য করা উচিত হয়নি। পত্রলেখক হচ্ছে যুক্তিবাদী অথচ আপনি ভক্তিমার্গের লোক। বহুদিন ধরে এই দুটি ধারা চলে আসছে এবং এদের সংঘর্ষের ইতিহাসও সুপ্রাচীন। এর একটি বলছে, 'আমাকে বোঝাও তাহলে আমি বিশ্বাস করব' এবং অন্যটি বলছে যে 'বিশ্বাস কর তারপর বোধোদয় হবে।' এর প্রথমটি যুক্তির উপর জোর দেয় এবং দ্বিতীয়টি কর্তৃত্ব নির্ভরিত। আপনি মনে করেন যে যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে নাস্তিক্যবাদ, ক্ষণস্থায়ী বিচারধারা এবং শীঘ্র বা বিলম্বে তাদের মনে বিশ্বাসের উদ্রেক হবে। আপনার অভিমতের সমর্থনের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের বহুখ্যাত উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। সুতরাং 'ছেলেটির' মঙ্গলের জন্য আপনি তাকে বাধ্যতামূলক প্রার্থনার ব্যবস্থাপত্র দিচ্ছেন। দু'রকম যুক্তি আপনি পেশ করেছেন। প্রথমতঃ নিজ ক্ষুদ্রতা ও কল্পিত উচ্চমার্গচারীর বিশালতা ও তার মহত্ব উপলব্ধি করে প্রার্থনার খাতিরেই প্রার্থনা করা এবং দ্বিতীয়ত এর প্রয়োজনীয়তার জন্য যারা সান্ত্বনা পেতে চায়, তাদের

সান্ত্বনা দেওয়া। প্রথমে দ্বিতীয় যুক্তিটি বিশ্লেষণ করব। এক্ষেত্রে এ ব্যবস্থাপত্র কতকটা যেন দুর্বলদের জন্যই দেওয়া হয়েছে। মানুষের চলার পথে এসব পরীক্ষা আসে। এসব মানুষের যুক্তিবাদের দুর্গ এর দাপটে এমনভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় যে শেষ পর্যন্ত অধিকাংশ লোকেরই প্রার্থনা ও বিশ্বাসের শরণ নিতে হয়। এতে তাদের অধিকার আছে এবং এর জন্য তারা অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু এই দুনিয়ায় বরাবরই এমন কিছু খাঁটি যুক্তিবাদী আছে এবং চিরকালই এমন কিছু যুক্তিবাদী থেকে যাবে, যারা সংখ্যায় অত্যল্প হলেও প্রার্থনা বা বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে না। এছাড়া এমন একশ্রেণীর লোক থাকে যারা ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তীব্র সন্দেহ পোষণ না করলেও কেমন যেন উদাসীন থাকে।

শেষ পর্যন্ত সবার পক্ষে যখন প্রার্থনার সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন নয় এবং যারা এর প্রয়োজনীয়তা বোধ করে, তাদের যখন এর শরণাপন্ন হবার স্বাধীনতা আছে এবং প্রয়োজনবিধায়ে তারা যখন এর শরণ নিয়েও থাকে, তখন প্রয়োজনীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে প্রার্থনাকে বাধ্যতামূলক করার স্বপক্ষে যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। দৈহিক ও মানসিক বিকাশের জন্য হয়তো বাধ্যতামূলক দেহচর্চা ও শিক্ষার প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু নৈতিক উন্নতির জন্য বাধ্যতামূলক প্রার্থনা বা ঈশ্বরে বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা নেই। এমন বহু নাস্তিক দেখা গেছে যাঁরা নীতি-বাগীশ হিসাবে উচ্চ মর্যাদা লাভ যোগ্য। আমার মনে হয় এইসব লোককে আপনার প্রথম যুক্তি অনুসারে আপনি প্রার্থনাকে শুধু প্রার্থনার খাতিরে নিজের দীনতা প্রকাশের উপায় হিসাবে গ্রহণ করতে বলবেন। এই দীনতা নিয়ে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। জ্ঞান রাজ্যের বিশালতা এত অধিক যে ক্ষেত্র বিশেষে শ্রেষ্ঠতম বৈজ্ঞানিকও নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করেন, কিন্তু তাঁদের ভিতর প্রচলিত ধারা হচ্ছে প্রভুত্বব্যঞ্জক অনুসন্ধিৎসা। নিজ শক্তিতে তাঁদের আস্থা তাঁদের প্রকৃতি বিজয়ের মতই শক্তিশালী। এ না হলে আজও আমরা কন্দ বা মূলের জন্য আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়তাম। তাই বা কেন, এতদিনে আমরা এই ধরাবক্ষ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতাম।

"হিমযুগে মানুষ যখন শীতে মারা যাবার উপক্রম হয়েছিল এবং যখন প্রথম আগুনের আবিষ্কার হয়, সেযুগে আপনার মত লোকেরা বোধহয় আবিষ্কারকদের বিদ্রূপ করে বলত, 'ঈশ্বরের শক্তি ও রোষের বিরুদ্ধে তোমাদের এসব তোড়-জোড়ের কি মূল্য আছে?' দীন ব্যক্তিদের জন্য তো পরকালে ঈশ্বরের রাজত্বের ব্যবস্থা রয়েছে। বলতে পারি না তারা সত্য সত্যই তা পাবে কিনা, তবে এদিকে এই পৃথিবীতে তাদের ভাগে তো দাসত্ব পড়েছে দেখা যাচ্ছে। আসল কথায়

এবার ফিরে যাওয়া যাক। 'বিশ্বাসের শরণ নাও, ভক্তি আপনি আসবে' বলে আপনি যা বলেছেন তা অতীব সত্য, মারাত্মক ভাবে সত্য। এই জাতীয় শিক্ষার মধ্যেই জগতের যাবতীয় ধর্মান্ধতার সূচনা খুঁজে পাওয়া যাবে। ছেলেবেলাতেই যদি ধরা যায় এবং বহুদিন ধরে তাদের কানের কাছে বারবার যদি জপা যায়, তবে মনুষ্য সমাজের অধিকাংশকে যা ইচ্ছা তাই বিশ্বাস করানো যায়। এইভাবে গোঁড়া হিন্দু ও গোঁড়া মুসলমানের সৃষ্টি হয়। তবে অবশ্য উভয় সম্প্রদায়েই অল্পসংখ্যক এমন কিছু লোক থাকেন, যাঁরা এসব উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া বিশ্বাসের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেন। আপনি কি জানেন যে বয়ঃপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত যদি হিন্দু বা মুসলমানদের নিজ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতে না দেওয়া হয়, তাহলে তারা তাদের কুসংস্কার সমূহের এরকম অন্ধ ভক্ত হবে না এবং এইসব গোঁড়ামি নিয়ে ঝগড়া করা ছেড়ে দেবে? হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার ওষুধ হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা; কিন্তু আপনি ওভাবে গড়ে ওঠেননি বলে একথা সমর্থন করতে পারেন না।

"যে দেশের লোকেরা সদা সর্বদা অতিমাত্রায় ভয়ভীত থাকত, সে দেশে সাহস, কর্মশক্তি ও আত্মত্যাগের অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় আপনার কাছে আমাদের ঋণ অপরিসীম হলেও আপনার অবদান সম্বন্ধে চূড়ান্ত অভিমত জ্ঞাপনকালে একথা বলতেই হবে যে আপনার প্রভাব এদেশের বৌদ্ধিক প্রগতির পক্ষে প্রচণ্ডভাবে বাধক হয়েছিল।"

কুড়ি বছরের একটি বালক যদি ছেলে না হয়, তবে ছেলে বলতে 'সাধারণ অর্থে' কি বুঝায় তা আমি জানি না। সত্যি কথা বলতে কি, বয়সের খেয়াল না করে প্রতিটি স্কুলের ছাত্রছাত্রীকে আমি ছেলে বা মেয়ে বলব। তবে উল্লিখিত ছাত্রটিকে ছেলে বা ব্যক্তি যাই বলা যাক না কেন, আমার যুক্তি এই ক্ষেত্রে সমভাবেই প্রযোজ্য। কোন প্রতিষ্ঠানে নাম দাখিল করে সে প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দেবার পর প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলাদি বিষয়ে ছাত্রের আর তর্ক-বিতর্ক করার অবকাশ থাকে না। কারণ ছাত্ররা হচ্ছে সৈনিকের মত এবং সৈনিকের বয়স চল্লিশ বছরও হতে পারে। নিজ বাহিনী হতে পৃথক হয়ে কোন সৈনিকের ইচ্ছামত কোন কিছু করা বা না করার অধিকার যেমন থাকে না, তেমনি কোন ছাত্র স্কুল বা কলেজে যোগদান করা মাত্র (তা সে যতই প্রবীণ বা জ্ঞানী হোক না কেন), সে প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা অগ্রাহ্য করার অধিকারচ্যুত হয়। এক্ষেত্রে ছাত্রটির বুদ্ধি কম ভাবা বা তার প্রতি হতশ্রদ্ধার কোন কথা উঠতে পারে না। বুদ্ধিমান হলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সে নিয়মশৃঙ্খলা মেনে চলবে। কিন্তু এক্ষেত্রে পত্রলেখক স্বেচ্ছায় শব্দের জুলুমের ভারী জোয়াল কাঁধে নিয়েছেন। যেসব

কার্যসম্পাদনে আদেশপালনকারীর আগ্রহ নেই তার প্রত্যেকটিতে তিনি 'বাধ্যতামূলক নির্দেশের' গন্ধ পেয়েছেন। তবে বাধ্যতামূলক ক্রিয়াব প্রকার ভেদ আছে। স্বয়ং আরোপিত বাধ্যতামূলক নির্দেশকে আমরা আত্মসংযম বলি। একে জড়িয়ে ধরে এর ছত্রছায়ায় আমরা বড হয়ে উঠি। কিন্তু জীবন দিয়ে যে বাধ্যতামূলক নির্দেশের বিরুদ্ধাচাবণ করতে হয়, তাকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া সংযম বলতে হবে এবং আমাদেব অপমান করা ও মানুষ হিসাবে (বা ইচ্ছা কবলে ছেলে হিসাবেও বলতে পাবেন) আমাদেব প্রাপ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করাই হয় তার লক্ষ্য। সামাজিক বিধিনিষেধসমূহ সাধাবণতঃ সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে থাকে ও নিজ দুর্বলতাব জন্য আমবা তাব বিরুদ্ধাচাবণ করে থাকি। অবমাননাকর নির্দেশেব নিকট আত্মসমর্পণ কবা ভীরুতা ও মনুষ্যত্ব বিবোধী। কিন্তু এব চেয়েও শোচনীয় ব্যাপার হচ্ছে আমাদেব চতুর্দিকে সঞ্চরণশীল রিপুব কবায়ত্ত হয়ে তার ক্রীতদাসে পবিণত হওয়া।

কিন্তু পত্রলেখক আব একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গেব অবতাবণা কবেছেন। এ হচ্ছে 'যুক্তিবাদ' নামক মহান শব্দ। আমি এতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। তবে অভিজ্ঞতা আমাকে এতটুকু বিনয়ী কবেছে যে ক্ষেত্রবিশেষে যুক্তিব সীমাবদ্ধ ক্ষমতাব কথা আমি বুঝতে পেবেছি। কোন জিনিস এলোমেলো থাকলে যেমন তা নোংবাব সামিল হয়, তেমনি যুক্তিব অপপ্রয়োগ বাতুলতা হয়ে দাঁডায়। যাব যা পাওনা তাকে তা দিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

যুক্তিবাদীরা প্রশংসার্হ ; কিন্তু নিজেকে সর্বশক্তিমান বলে দাবী কবলে যুক্তিবাদ বিকটদর্শন দৈত্য হয়ে দাঁডায়। যুক্তিকে সর্বশক্তিমান মনে কবা, গাছপালা, নুডি, পাথবকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করাব মতই পৌত্তলিকতাব প্রতীক।

প্রার্থনার প্রয়োজনীয়তা কে অস্বীকাব কবতে পেবেছে ? প্রার্থনা কবতে কবতে এব উপকারিতা বোঝা যায়। এই হচ্ছে বিশ্বেব চিব প্রচলিত বীতি। কার্ডিনাল নিউম্যান তাঁর যুক্তি বিসর্জন দেননি, কিন্তু 'পববর্তী পদক্ষেপেই আমার কাছে যথেষ্ট' গাইবাব সময় তিনি শুধু প্রার্থনাকে এব চেয়ে উচ্চস্থান দিয়েছিলেন। শঙ্কর যুক্তিবাদীদের শিবোমনি ছিলেন। বিশ্ব সাহিত্যে বোধহয় এমন কিছু নেই যা শঙ্কবের যুক্তিবাদেব উপরে যেতে পাবে। কিন্তু তিনিও প্রার্থনা ও বিশ্বাসকে প্রথম স্থান দিয়েছিলেন।

পত্রলেখক শিথিলভাবে আমাদের সমক্ষে সংঘটিত দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং অস্বস্তিকর ঘটনাবলীব সমীকরণ করেছেন। কিন্তু বিশ্বের প্রতিটি জিনিসের ব্যতিক্রম আছে। মনে হয় মানব সম্পর্কিত সকল বিষয়ের নিয়ামক এই নীতি। এ বিষয়ে

কোন সন্দেহ নেই যে এযাবৎ কাল ইতিহাসে যেসব বীভৎস অপরাধের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তার অনেকগুলির জন্য ধর্মকে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু তার জন্য দায়ী নরদেহস্থিত শাসনবিহীন পাশববৃত্তি ধর্ম নয়। মানুষ এখনও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পশুপ্রবৃত্তি বর্জন করেনি।

এমন কোন যুক্তিবাদীর খোঁজ আমি পাইনি, যাঁর প্রত্যেকটি কার্যের ভিত্তি হচ্ছে যুক্তি এবং সহজ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি কদাচ কিছু করেন নি। কিন্তু আমরা সবাই জানি যে এমন সব লক্ষ লক্ষ মনুর সন্তান বিদ্যমান, যারা আমাদের সকলের জনকের প্রতি শিশুর মত সরল বিশ্বাস পোষণ করে একরকম সুষ্ঠু ও সঙ্গতি-পূর্ণ জীবন যাপন করছে। এই বিশ্বাসের নামই প্রার্থনা। যে "বালকটির" চিঠির উপর ভিত্তি করে আমি প্রথমোক্ত প্রবন্ধটি লিখেছিলাম, সে ঐ জাতীয় বিশাল মানব সাগরেরই অংশ এবং আমার প্রবন্ধটির উদ্দেশ্য ছিল তাকে এবং তার সহ-যাত্রীদের হৃদয়ে সাহস সঞ্চার করা। পত্রলেখকের মত যুক্তিবাদীদের আনন্দে বাধা সৃষ্টি করার কোন উদ্দেশ্য আমার ছিল না।

তাবৎ যুবকের মনে তাদের গুরুজন ও শিক্ষকবৃন্দ যে ছাপ সৃষ্টি করতে চান, পত্রলেখক কিন্তু তাতেও আপত্তি করেছেন। এটা কিন্তু মনে হয় কাঁচ বয়সের দরুণ অনতিক্রমনীয় বাধা (?)। একেবারে ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ও শিশুমনকে বিশেষ একটি ধাঁচে গড়ার চেষ্টা। পত্রলেখক একথা মেনে নিয়ে ভালই করেছেন যে দেহ ও মনকে শিক্ষা ও নির্দেশ দেওয়া চলবে। যে আত্মা থেকে দেহ ও মনের সৃষ্টি, সে সম্বন্ধে তিনি চিন্তিত নন বা হয়তো এর অস্তিত্ব সম্বন্ধেই সন্দিহান। কিন্তু তাঁর অবিশ্বাসে কাজ হবে না। তাঁর যুক্তির পরিণামের হাত তিনি এড়াতে পারেন না। কারণ একজন আস্তিক কেন এই যুক্তি পেশ করতে পারবে না যে, অন্য সকলে যেমন বালক-বালিকাদের দেহ ও বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রভাবান্বিত করে, তখন সেই বা কেন তাদের আত্মাকে প্রভাবান্বিত করবে না? সত্যকার ধর্মীয়-বোধ জাগ্রত হলে ধর্ম শিক্ষার কুফল দূরীভূত হবে। ধর্ম শিক্ষা বর্জন করার অর্থ হচ্ছে জমির সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে অজ্ঞতার জন্য কৃষিক্ষেত্রকে অনাবাদী রেখে তাতে আগাছা জন্মাতে দেওয়া।

পত্রলেখক পুরাকালের যে সকল মহান আবিষ্কারের পুনরুল্লেখ করেছেন, আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই। এসব আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা বা চমৎকারিত্ব সম্বন্ধে কেউ কোন সন্দেহ পোষণ করে না এবং আমি তো করিই না। বিশ্বাসের প্রয়োগ ও অনুশীলনের জন্য ওগুলি ছিল উপযুক্ত ক্ষেত্র। কিন্তু আমাদের পূর্বাচার্যেরা স্বীয় জীবন হতে বিশ্বাস ও প্রার্থনার গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার বিলোপ সাধন

করেন নি। বিশ্বাস ও প্রার্থনার সম্পর্কবিহীন কর্ম হচ্ছে সৌরভবিহীন কৃত্রিম পুষ্পের মত। যুক্তির অবদমন আমি চাই না। আমাদের অন্তঃস্থিত যে শক্তি স্বয়ং যুক্তিকে পরিশুদ্ধ করে, আমি তার যথোচিত স্বীকৃতিকামী।

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১৪-১০-১৯২৬

২০। বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের বক্তৃতা

অনেকে গান্ধীজীকে বলেছেন, "ঢের হয়েছে এবার। এখন তো কেউ আর আপনার কথায় কান দিচ্ছে না। তাহলে খদ্দরের কথা আর কেন?" কিন্তু গান্ধীজী বললেন, "আমাদের চোখের সামনে মৃত্যুর অধিক অত্যাচারের সম্মুখীন প্রহ্লাদের রাম নাম না ছাড়ার উদাহরণ থাকতে আমি আমার প্রিয় মন্ত্র জপ করা ত্যাগ করব কেন? আর আমাকে তো এখনও কোন অত্যাচার সইতে হয়নি। দেশের বর্তমান অবস্থা আমাকে আভাসে যে বাণী শুনিয়ে যায়, তা আমি ছাড়ি কেমন করে? পণ্ডিতজী রাজা মহারাজদের কাছ থেকে তোমাদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেছেন ও এখনও তা করে যাচ্ছেন। দৃশ্যতঃ মনে হয় ও অর্থ আসছে ঐসব ধণাঢ্য রাজন্য-বর্গের কাছ থেকে; কিন্তু বস্তুতঃ দেশের কোটী কোটী দরিদ্র ব্যক্তি ঐ অর্থ জোগাচ্ছে। কারণ ইউরোপের অবস্থা থেকে আমাদের অবস্থা পৃথক। আমাদের দেশের ধনীক সম্প্রদায় গ্রামবাসীদেব মেরে বড়লোক হয় এবং এই গ্রামবাসীদের অধিকাংশ দৈনিক একবেলাও পেট ভরে খেতে পায় না। এইভাবে বুভুক্ষু জনগণ আজ তোমাদের শিক্ষার ব্যয় নির্বাহ করছে এবং এরা কোন দিনই এ শিক্ষার স্বাদ-গ্রহণ করার সুযোগ পাবে না। দরিদ্ররা যে শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করতে পায় না তা প্রত্যাখ্যান করা তোমাদের কর্তব্য হলেও আজ আমি তোমাদের কাছ থেকে অতটা দাবী করব না। তাদের জন্য একটুখানি যাজন করে আমি তোমাদের দরিদ্রদের এই আত্মত্যাগের কথঞ্চিৎ প্রতিদান দিতে বলছি। কারণ গীতায় বলছে যে যাজন না করে যে খাদ্য গ্রহণ করে, সে চুরি করছে। যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নাগরিকদের যাজন ছিল প্রত্যেকের গৃহসংলগ্ন উদ্যানে কিছু আলু উৎপন্ন করা ও কিছু সেলাইএর কাজ করা। আমাদের কাছে ও আমাদের কালে এখন যাজন অর্থে সুতা কাটা। দিনরাত আমি একথা বলছি ও এ সম্বন্ধে লিখছি। আজ আর নতুন কিছু বলব না। ভারতের দরিদ্রদের কথা যদি তোমাদের অন্তর স্পর্শ করে থাকে, তাহলে আমি চাই যে কাল তোমরা কৃপালিনীর খদ্দরের কাহিনী পড়বে ও ঐ বইটির মজুদ ভাণ্ডার নিঃশেষ করবে এবং আজ তোমরা খদ্দর কিনে

তোমাদের সঞ্চয় নিঃশেষ করবে। পণ্ডিতজী ভিক্ষাকে কলারূপে চর্চা করেছেন। এ বিদ্যা আমি তাঁর কাছ থেকে শিখেছি এবং তিনি যদি রাজন্যবর্গের ভার লাঘব করার বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন, তবে অধিকতর দরিদ্রদের জন্য দরিদ্রদের পকেট খালি করার ব্যাপারেও আমি নির্লজ্জ রকমের ওস্তাদ।

তোমাদের জন্য লক্ষ লক্ষ টাকা ভিক্ষা করা ও এইসব রাজোচিত অট্টালিকা নির্মাণের পিছনে মালব্যজীর একটিমাত্র উদ্দেশ্য আছে এবং তা হচ্ছে দেশে নির্মল জ্যোতি বিকীর্ণকারী রত্ন সৃষ্টি করা। এরা সুস্থ ও সবল নাগরিক হয়ে দেশমাতৃকার সেবা করবে। পশ্চিম থেকে আজ যে অপবিত্রতার বায়ু আসছে তাতে যদি তোমরা বয়ে যাও, তবে সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। আর এ পদ্ধতির প্রতি ইউরোপের সর্বসাধারণের সমর্থন নেই। ইউরোপে আমাদের এমন সব সাথী আছেন, অবশ্য সংখ্যায় তাঁরা অতি অল্পই, যাঁরা এই বিষাক্ত ধবণধাবণেব প্রতিরোধ করার জন্য কঠিন সংগ্রাম করছেন। কিন্তু তোমরা যদি সময়মত না জাগো তাহলে দুর্নীতির যে লহরী দ্রুত শক্তি সঞ্চার করছে, তা হয়তো শীঘ্রই তোমাদের পরিবেষ্টন করে পরাভূত করবে। তাই কণ্ঠে শেষ বিন্দু শক্তি প্রয়োগ করে আমি চীৎকার করে বলছি, "অগ্নিশিখায় ভস্মসাৎ হবার পূর্বে সতর্ক হয়ে দূরে পালাও।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া ২০-১ ১৯২৭

২১। বিহার বিদ্যাপীঠে সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত অভিভাষণ

শুধু ছাত্রদেরই নয়, উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দিলেও সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে গান্ধীজী যে অভিভাষণ দেন, তাকে বক্তৃতা আখ্যা দেবার পরিবর্তে বরং প্রাণখোলা আলাপ বলাই অধিকতর সঙ্গত। অবশ্য তাঁর পক্ষে জনসাধারণের মনে প্রতীতি জন্মানো অপেক্ষাকৃত সহজ। কারণ তারা শুধু কণ্ঠনিসৃত বাণী শোনে না, হৃদয়ের না বলা ভাষাও তারা বোঝে। সেখানকার সেই আলোচনা ছিল রসঘন ব্যঞ্জনায় সমুজ্জ্বল ও নিজ স্মৃতিকথার উক্তিতে পরিপূর্ণ।

প্রথমেই তিনি এই আশা প্রকাশ করলেন যে, সেদিন স্নাতকরা যে পবিত্র শপথ গ্রহণ করেছে তদনুযায়ী তারা জীবন যাপন করবে। গুজরাট বিদ্যাপীঠের সমাবর্তন উপলক্ষে তিনি যা বলেছিলেন, তার পুনরাবৃত্তি করে তিনি বললেন যে, যদি একজন মাত্র আদর্শ শিক্ষক ও একজনও আদর্শ ছাত্র তৈরী হয়, তাহলে এই

বিদ্যাপীঠ প্রয়োজনাতিরিক্ত কাজ করেছে বলে মানতে হবে। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানের কাজ কি? এদের কাজ হচ্ছে সংখ্যায় যতই কম হোক না কেন, সাচ্চা রত্ন খুঁজে বার করা।

এরপর তিনি অসহযোগী প্রতিষ্ঠানগুলির ক্রিয়াত্মক এবং নেতিবাচক দিকের উল্লেখ করেন। প্রচলিত প্রতিষ্ঠানগুলি এর নেতিবাচক দিক অর্থাৎ সরকারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কাজে সফল হয়েছে। যে বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও শিক্ষকদের তিনি সরকারী বিদ্যালয় ছাড়িয়েছেন, তার কথা মনে পড়লে তাঁর মনে বিন্দুমাত্র অনুশোচনা হয় না। এদের মধ্যে অনেকেই আবার পুরাতন জায়গায় ফিরে গেছে এবং আরও অনেকে বর্তমান অবস্থায় অসন্তুষ্ট জেনেও তাঁর মনে তিলমাত্র অনুতাপ জন্মায়নি। এদের জন্য তাঁর দুঃখ হয়, এদের প্রতি তিনি সহানুভূতি বোধ করেন; কিন্তু মনে কখনও অনুতাপ বা অনুশোচনা হয়নি। "এই সব দুঃখ কষ্ট আমাদের দৈনন্দিন ললাট লিখন এবং এ আমাদের নিত্যসাথী। সত্যপালন যদি কুসুমাকীর্ণ শয্যায় শয়নতুল্য হয়, সত্যের জন্য যদি ত্যাগ ও কৃচ্ছ্রসাধন নিষ্প্রোয়জন হয় ও এ পথে সবাই যদি সুখ ও আরাম পায়, তাহলে সত্যের কোন সৌন্দর্যই অবশিষ্ট থাকবে না। মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লেও আমাদের সত্য আঁকড়ে থাকতে হবে। সত্যপথাশ্রয়ী হবার জন্য আমাদের যদি ভারতবর্ষসহ সমগ্র বিশ্ব হারাতে হয়, তবে তাতে ক্ষতি কি? ঈশ্বরকৃপা লাভে সমর্থ হলে ভারতবর্ষসহ সমগ্র বিশ্ব আমাদের হবে এই বিশ্বাস হৃদয়ে নিয়ে জীবনে মরণে সত্যকে অনুসরণ করলে আমরা খাঁটি সত্যাশ্রয়ী বলে পরিগণিত হব। আমি জানি যে আমাদের শিক্ষক ও অধ্যাপকমণ্ডলীর অনেকেই চঞ্চল হয়ে উঠেছেন। দেশের আবহাওয়ায় পবিত্রতার পরশ দিতে হলে এই হচ্ছে খাঁটি প্রায়শ্চিত্ত।"

এ হচ্ছে নেতিবাচক কার্যক্রম এবং এ কাজের ব্যাপকতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে যথোচিত পরিমাণ প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে জেনে তিনি সুখী। কিন্তু এই দ্বৈত বিশ্বের একটি ক্রিয়াত্মক দিকও আছে। এই দিকটিকে অধিকতর কঠিন আবার স্থায়ী ফলপ্রদ দুই বলা চলে। এই জাতীয় বিদ্যাপীঠ ছাড়া আর কোথায় সে আদর্শ মূর্ত হতে পারে? এরপর তিনি ইউরোপ ও ভারতের শিক্ষাপদ্ধতির তুলনামূলক সমালোচনা করেন। "ইউরোপে ছাত্রের যেদিকে প্রতিভা আছে তার কথা খেয়াল করে শিক্ষা দেওয়া হয়। দেশের সংস্কৃতি ও প্রতিভার কথা স্মরণে রেখে একই বিষয় তিনটি দেশে হয়ত ত্রিবিধ উপায়ে শেখানো হয়ে থাকে। আমরা শুধু ইংরাজী পদ্ধতির দাসোচিত অনুকরণে আনন্দ পেয়ে থাকি। বর্তমান শিক্ষা-পদ্ধতির একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের পাশ্চাত্য পদ্ধতির একান্ত বশম্বদ অনুকরণ-

কারীতে পরিণত করা। অবশ্য এতে আশ্চর্যের কারণ নেই। কারণ আমাদের অবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনে সম্পূর্ণরূপে অনিচ্ছুক একদল ব্যক্তিকে দেশের যাবতীয় ক্রিয়াকলাপের অধিনায়কপদে বরণ করার অনিবার্য পরিণতি হচ্ছে এই। মেকলে বেচারী আর কি করতে পারেন? তিনি মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে সংস্কৃত সাহিত্যই আমাদের যাবতীয় কুসংস্কারের মূল এবং তাই পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরূপী জীবন রসায়ন দিয়ে তিনি আমাদের পুষ্ট করতে মনস্থ করেছিলেন। অজ্ঞাতসারে আমাদের সর্বনাশের কারণ হয়েছিলেন বলে মেকলেকে তাই নিন্দা করার প্রয়োজন নেই। ইংরাজী ভাষা আমাদের শিক্ষার মাধ্যম হওয়ায় আমরা সবটুকু স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছি। আমাদের অবস্থা পক্ষবিহীন পক্ষীর ন্যায়। আমাদের জীবনের চরমকাম্য হচ্ছে কেরানীগিরি বা সম্পাদকত্ব। এই পদ্ধতিতে আমাদের ভিতর একজন হয়ত লর্ড সিনহা হয়েছেন; কিন্তু বাদবাকি সকলেই খুব বেশী হলে এই বিরাট বিদেশী যন্ত্রের অংশমাত্র। মজঃফরপুরে একটি ছেলে আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে জাতীয় বিদ্যালয়ে গিয়ে সে লাটসাহেব হতে পারবে কিনা? আমি তাকে জবাব দিয়েছিলাম, "না, তুমি গ্রাম্য লাট হতে পার; কিন্তু লর্ড সিনহা হতে পারবে না। সে ক্ষমতা আছে শুধু লর্ড বার্কনহেডের।"

দরিদ্রের পক্ষে যে শিক্ষা ব্যবস্থার স্বাদগ্রহণ করা অসম্ভব, তার পীঠস্থান রচনার জন্য দরিদ্রেরই অর্থে নিত্য নূতন প্রাসাদোপম হর্ম্যবাজি নির্মাণ করার যে উন্মত্ততা দেশে প্রকট হচ্ছে, এরপর তিনি তার উল্লেখ করলেন: "একবার এলাহাবাদের ইকনমিক ইনস্টিটিউটে যাবার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রফেসর জীভনস্ আমাকে প্রতিষ্ঠানটি দেখাতে দেখাতে যখন বললেন যে এর ঘরবাড়ী তৈরী করতে ৩০ লক্ষ টাকার মত লেগেছে, তখন আমার হৃৎকম্প উপস্থিত হ'ল। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে অনশনে না রেখে এসব প্রাসাদ নির্মাণ করা সম্ভব নয়। নূতন দিল্লীর দিকে তাকিয়ে দেখ, ঐ একই কাহিনী শুনতে পাবে। রেলগাড়ীর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যে চমকপ্রদ উন্নতি সাধন করা হয়েছে তার দিকে তাকাও। এর মধ্যে সুবিধাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তির কথা খেয়াল করে দরিদ্রদের অবহেলা করার মনোভাব প্রকাশ পাচ্ছে। শয়তানী না বলে একে আর কি আখ্যা দেওয়া যায়? সত্যি কথা বলতে গেলে এর চেয়ে আর কতটুকু কম বলা যায়? এ পদ্ধতির জনকদের সঙ্গে আমার কোন বিবাদ নেই। তাদের অন্য উপায় ছিল না। হাতী কি কখনও পিঁপড়ের কথা মনে রাখে? আমাদের প্রত্যেকটি কার্য নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব তাঁদের হাতে এবং তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিও যদি বিশ্বের যাবতীয় সদিচ্ছা নিয়ে একাজে নামেন, তবু আমাদের মত সুষ্ঠুভাবে একাজ নিষ্পন্ন করতে পারবেন না। কারণ তাঁদের

দৃষ্টিভঙ্গী আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা সুবিধাপ্রাপ্ত মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করেন। আমাদের চিন্তা করতে হবে বুভুক্ষু জনসাধারণের দৃষ্টিকোণ থেকে।"

এর থেকে স্বভাবতই চরকার কথা উঠল এবং তিনি মন্তব্য করলেন যে চরকাই হবে আমাদের জাতীয় কার্যকলাপের অক্ষদণ্ড বা কেন্দ্রবিন্দু।

"স্নাতকরা ডিগ্রী নিক এবং যা ইচ্ছা শিখুক।ঃ কিন্তু এ শিক্ষা যেন চরকা-কেন্দ্রিক হয়। তারা যে অর্থশাস্ত্র ও বিজ্ঞান শিখবে তা যেন চরকার সহায়তার্থে প্রযুক্ত হয়। চরকাকে যেন এক কোণে নির্বাসন না দেওয়া হয়। আমাদের যাবতীয় কর্মের সৌরজগতে চরকার স্থান সূর্যের মত। চরকা বিনা বিদ্যাপীঠ শুধু নামেই। লর্ড আরউইন একটি অতি সত্য কথা বলেছেন যে আইন পরিষদ আদির ভিতর দিয়ে যে কোন উন্নতির কথা চিন্তা করতে হলে, আমাদের ব্রিটিশ পার্লামেণ্টকে চোখের সামনে রাখতে হবে। তাঁর প্রতি ক্ষুব্ধ হবার কারণ নেই। এ পদ্ধতির সূর্য লণ্ডন এবং আমাদের পদ্ধতির সূর্য চরকা। আমি হয়ত ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করছি ; কিন্তু সে সম্বন্ধে আমাকে বুঝিয়ে না দিলে আমার মত পরিবর্তন হবে না। চরকা আর যাই করুক, কারও ক্ষতি করে না এবং চরকাকে বাদ দিলে আমরা (এবং আমি বলব যে সমগ্র বিশ্ব) উৎসন্নে যাবে। যে যুদ্ধের সময় অসত্য ভাষণকে উচ্চ কোটির ধর্ম আখ্যা দেওয়া হত, তার অবসানের পর ইউরোপের কি মনে হচ্ছে তা আমরা জানি। যুদ্ধোত্তর প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ব আজ ক্লান্ত এবং ভারতের আজকের অভয়দাতা চরকা কাল বিশ্বত্রাতার রূপ নিতে পারে। কারণ চরকার বনিয়াদ 'অধিক সংখ্যকের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থার' উপর নয়, এর লক্ষ্য হচ্ছে সকলের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা করা। কোন মানুষকে যখন আমি ভুল করতে দেখি, তখন মনে হয় ও ভুল আমারও। ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষ দেখলে আমার মনে পড়ে যে আমারও একদিন অমন গেছে। এইভাবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি লোকের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করি ও মনে হয় আমাদের মধ্যে দীনতম ব্যক্তিটি সুখী না হওয়া পর্যন্ত আমার সুখ নেই। এইজন্য আমি চরকাকে তোমাদের অধ্যয়নের কেন্দ্রবিন্দু করতে চাই। প্রহ্লাদ যেমন সর্বত্র রামকে দেখত এবং তুলসীদাস যেমন কৃষ্ণের বিগ্রহতেও রামের মূর্তি দেখতেন, তেমনি তোমাদের সকল জ্ঞান যেন চরকার তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার জন্য নিয়োজিত হয়। আমাদের বিজ্ঞান, সূত্রধরবিদ্যা ও অর্থশাস্ত্রআদি সকল বিষয়ই যেন চরকাকে দেশের দরিদ্রতম ব্যক্তিটির মুখ্য অবলম্বনে রূপায়িত করার কার্যে প্রযুক্ত হয়।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া—১০-২-১৯২৭।

২২। সম্মেলনে ছাত্রদল

সিন্ধুর ষষ্ঠ ছাত্র সম্মেলনের সম্পাদক আমার কাছে বাণী চেয়ে একটি ছাপানো চিঠি পাঠান। ঐ একই অনুরোধ জানিয়ে আমাব কাছে একটি তারও পাঠানো হয়। কিন্তু সে সময় আমি প্রায় এক দুর্গম এলাকায় ছিলাম বলে ঐ চিঠি ও তার এমন সময় হাতে এলো যখন আর বাণী পাঠাবার সময় নেই বললেই চলে। এছাড়া বাণী, রচনা এবং ঐ জাতীয় যত কিছু পাঠানোর জন্য আমার কাছে এত অনুরোধ আসে যে তার প্রত্যেকটি রক্ষা কবাও আমার পক্ষে সম্ভবপর নয়। তবে নিজেকে আমি ছাত্রদল সংশ্লিষ্ট সব কিছু সম্বন্ধে কৌতূহলী বলে প্রচার করি এবং তাছাড়া সমগ্র ভাবতের ছাত্র সমাজের সঙ্গে আমি কথঞ্চিৎ সম্পর্কিত বলে সেই ছাপানো নিমন্ত্রণ পত্রে যে কার্যসূচীর খসড়া দেখেছিলাম, মনে মনে তার সমালোচনা না করে থাকতে পারলাম না। হয়ত কারও কোন উপকারে লাগবে এই ভেবে আমি আমার মনেব কথার কতকাংশ কাগজে লিপিবদ্ধ করছি এবং ছাত্র সমাজের কাছে তা পেশ করছি। নিমন্ত্রণ পত্রটি ভালভাবে ছাপা নয় এবং তাতে এমন সব ভুল ছিল যা ছাত্র সমাজেব পক্ষে শ্লাঘনীয় নয়। যাই হোক, নিমন্ত্রণ পত্রটির নিম্নলিখিত অংশসমূহ প্রথমে উদ্ধৃত করছি।

"সম্মেলনের উদ্যোক্তাবা সম্মেলনকে যথাসম্ভব চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষামূলক করার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন।...আমরা ধারাবাহিক ভাবে শিক্ষামূলক আলোচনার অনুষ্ঠান করতে ইচ্ছুক এবং আপনাব কাছে এজন্য সহযোগিতাকামী।...সিন্ধুর নারী শিক্ষাব বিষয় বিশেষ ভাবে বিবেচ্য।...ছাত্রদের অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা চোখ বুঁজে নেই। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা কবা হচ্ছে এবং আশা করা যায় যে বিতর্ক প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে এই কর্মসূচী সম্মেলনকে অধিকতর চিত্তাকর্ষক করবে। আমাদের কার্যসূচী থেকে নাটকাভিনয় ও সঙ্গীত বাদ পড়েনি।...উর্দু এবং ইংবাজী নাটকের অংশ বিশেষ অভিনীত হবে।"

সম্মেলনের নির্ধারিত কর্মসূচী সম্বন্ধে সম্যক ধারণা উদ্রেক সক্ষম কোন বাক্য আমি নিমন্ত্রণপত্র থেকে বর্জন করে পূর্বোক্ত উদ্ধৃতি রচনা করিনি। তবু ওর মধ্যে কেউ এমন কোন বিষয়ের উল্লেখ পাবেন না যার স্থায়ী মর্যাদা আছে। আমার কোন সন্দেহ নেই যে নাটক, সঙ্গীত এবং দৈহিক কসরতের অনুষ্ঠানগুলি "অতীব সুন্দর ভাবে" অনুষ্ঠিত হয়। বন্ধনীর ভিতরে লিখিত কথাটি আমি নিমন্ত্রণ পত্র

থেকে উদ্ধৃত করেছি। সম্মেলনে নারী শিক্ষা সম্বন্ধে যে চিত্তাকর্ষক প্রবন্ধ পঠিত হয়েছিল, এবিষয়ে আমার মনে সংশয় নেই। কিন্তু যে "দেতি লেতি" (পণ) প্রথার প্রভাব ছাত্রবাও কাটিয়ে উঠতে পারেনি এবং যার জন্য সিন্ধী মেয়েদের জীবন অনেকক্ষেত্রে নরকসদৃশ এবং মেয়েদের অভিভাবকদের কাছে যা জুলুমতুল্য, সেই প্রথা সম্বন্ধে সম্মেলনের নিমন্ত্রণ পত্রে কোনরূপ উল্লেখ নেই। নিমন্ত্রণ পত্রে এমন কিছু ছিল না যাতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে সম্মেলন ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের উন্নতির বিষয়ে কিছু করতে চায়। ছাত্রদের ভয়লেশহীন জাতি গঠনকারীরূপে গড়ে তোলার জন্য যে সম্মেলন কিছু করতে চায়, তারও কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এটা একটা কম কথা নয় যে দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সিন্ধু প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপকদল সরবরাহ করছে। কিন্তু যারা বেশী দেয়, তাদের কাছেই না সর্বদা আরও বেশী আশা করা হয়। বিশেষ করে গুজরাঠ বিদ্যাপীঠে উচ্চ কোটার সহকর্মী সংগ্রহ করে দেবার জন্য আমার যখন সিন্ধু বন্ধুদের প্রতি অতিশয় কৃতজ্ঞ থাকা প্রয়োজন, তখন আমি অন্ততঃ শুধু অধ্যাপক ও খাদি কর্মী পেয়ে সন্তুষ্ট থাকব না। সিন্ধুতে সাধু ভাস্বানীব জন্ম। একাধিক মহান সমাজ সংস্কারকের কারণ সিন্ধু গর্ব করতে পারে। কিন্তু যদি শুধু সিন্ধুব সাধু বা সংস্কারকদের প্রশংসা আত্মসাৎ কবে ছাত্ররা সন্তুষ্টি বোধ করে, তবে তারা অন্যায় করছে বলতে হবে। তাদের জাতি গঠনকারী হতে হবে। পশ্চিমের মেকী অনুকবণ এবং শুদ্ধ ও সুললিত ইংরাজী বলা ও লেখার ক্ষমতা মুক্তি মন্দিব নির্মাণ কার্যে বিন্দুমাত্র সহায়ক হবে না। বুভুক্ষু ভারতের পক্ষে অতীব ব্যয়বহুল এক শিক্ষাপদ্ধতির সুযোগ ছাত্ররা পাচ্ছে এবং এ শিক্ষা পাবার আশা পোষণ করতে পারে অতীব স্বল্পসংখ্যক কয়েকজন মাত্র। জাতির বেদীমূলে নিজেদের হৃৎপিণ্ড ডালি দিযে ছাত্রদের এই শিক্ষার মূল্য পবি-শোধ করতে হবে। প্রাচীনপন্থী প্রথার সংস্কার কার্যে ছাত্রদের অগ্রদূতের পদ গ্রহণ করতে হবে এবং জাতির জীবনযাত্রায় যা কিছু শুভ তা বজায় রেখে সমাজে যে বহুবিধ কদাচার অনুপ্রবেশ করেছে তার থেকে সমাজকে মুক্ত করতে হবে।

এইসব সম্মেলনের কাজ হচ্ছে বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে ছাত্রদের চক্ষুরুন্মীলন কবে দেওয়া। বিদেশী ধাঁচে শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালিত হওয়ায় ক্লাসে যেসব বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করা সম্ভব নয়, এইসব সম্মেলন সে সম্বন্ধে ছাত্রদের চিন্তা করতে শেখাবে। যেসব বিষয়কে নিছক রাজনীতি বলে মনে করা হয়, ছাত্ররা হয়তো এসব সম্মেলনে তার আলোচনাব সুযোগ পাবে না। তবে জাতির কাছে গভীরতম রাজনৈতিক সমস্যার মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও আর্থিক প্রশ্নাবলী তারা অধ্যয়ন ও পর্যালোচনা করতে পারে এবং এ করাই উচিত। জাতির এমন কোন

অংশ নেই যা জাতিগঠনমূলক কার্যসূচীর আওতায় পড়ে না। মূক জনগণের মনে ছাত্রদের প্রভাব সৃষ্টি করতে হবে। ছাত্রদের কোন প্রদেশ, শহর, জাতি বা বর্ণের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে চলবে না। আমাদেরই জন্য এই বিশাল মহাদেশের প্রতিটি অধিবাসী অস্পৃশ্য, মদ্যপ, গুণ্ডা এবং এমন কি বেশ্যা আদির অস্তিত্ব সমাজে সম্ভবপর হয়েছে। ছাত্রসমাজকে তাদের দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করা শিখতে হবে। প্রাচীনকালে ছাত্রদের বলা হত ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ঈশ্বরের সংসর্গে পরিভ্রমণকারী। রাজন্যবর্গ এবং বযোজ্যেষ্ঠরা তাদের সম্মান করতেন। জাতি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদের ভার নিত এবং এর পরিবর্তে তারা জাতিকে দিত শত শত বজ্র কঠিন আত্মা, তীক্ষ্ণ মেধা এবং বলশালী ভুজসমূহ। বর্তমান বিশ্বে দুর্দশাগ্রস্ত জাতিসমূহের মাঝে ছাত্রদের সর্বত্র ভবিষ্যৎ আশাস্থল বলে বিবেচনা করা হয় এবং সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা সংস্কারের জন্য আত্মোৎসর্গকারী নেতার পদাভিষিক্ত হয়। ভারতে যে এর নিদর্শন নেই এমন কথা নয়, তবে তাদের সংখ্যা অতীব নগণ্য। আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে ব্রহ্মচারীর উপযুক্ত এইসব কাজ করাই হবে ছাত্র সম্মেলনের আদর্শ।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—৯-৬-১৯২৭।

২৩। বাঙ্গালোর বিজ্ঞান মন্দিরের অভিভাষণ

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তিনি বললেন, "কোথায় যে এসেছি একথা ভেবে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। আমার মত যে গ্রামবাসী এসব দেখে ভীতিজড়িত শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে রুদ্ধবাক্ হয়ে পড়ে, তার এখানে স্থান নেই। বেশী কিছু বলার অবস্থা আমার নেই। আমি শুধু এইটুকুই বলব যে এখানের এইসব বিরাট বিরাট গবেষণাগার ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি দেখার সুযোগ পাওয়া গেছে লক্ষ লক্ষ জনের ইচ্ছাবিরুদ্ধ এবং বাধ্যতামূলক শ্রমের কারণে। কারণ টাটার ত্রিশলক্ষ টাকা বাইরে থেকে আসেনি, আর মহীশূর রাজের দানের উৎস ও বেগার প্রথা ছাড়া আর কি? যেসব অট্টালিকা ও যন্ত্রপাতি কোন কালেই গ্রামবাসীদের উপকারে আসবে না, বরঞ্চ ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাজে লাগবে, তার জন্য কিভাবে আমরা তাদের অর্থের সদ্ব্যয় করছি একথা যদি আমরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের বুঝাতে যাই, তাহলে তারা তা বুঝতেই পারবে না। এসব কথায় তারা কোন উৎসাহ প্রকাশ করবে না। আমরা কিন্তু তাদের আস্থা অর্জনের কোন চেষ্টাই করি না এবং এসব সুবিধা পাওয়া স্বতঃসিদ্ধ অধিকার বলে মনে করি। আমরা ভুলে যাই যে 'প্রতি-

নিবিষের অধিকার না দিলে কর দেব না'—এই নীতি তাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এই নিয়ম যদি সত্যি সত্যি তাদের প্রতি প্রয়োগ কর এবং তাদের টাকা পয়সার হিসাব-কিতাব তাদের কাছে দাখিল করার দায়িত্ব যদি বোধ কর, তবে দেখতে পাবে যে এইসব গবেষক নিয়োগের অন্য আর একটি দিক আছে। তখন তোমরা নিজ হৃদয়ে এদের জন্য সংকীর্ণ স্থান নয়, অনেকখানি জায়গা আছে দেখতে পাবে। হৃদয়েব এই বিস্তীর্ণ স্থানটুকুর যদি তোমরা উচিতমত হেফাজত কর, তাহলে যেসব লক্ষ লক্ষ জনগণের মেহনতের উপর তোমাদের শিক্ষা নির্ভরশীল, তাদের মঙ্গলের জন্য তোমরা তোমাদের জ্ঞান নিয়োগ করবে। তোমরা আমাকে যে টাকার থলি দিয়েছ, তা আমি দরিদ্রনারায়ণের কাজে নিয়োগ করব। সত্যকার দরিদ্রনারায়ণকে আমি চোখে দেখি নি, শুধু তার কল্পনা করে নিয়েছি। সুদূর যোগাযোগ বিহীন গ্রামের নিভৃত পল্লীর অধিবাসী যেসব কাটুনী এই অর্থ পাবে, তারাও সত্যকার দরিদ্রনারায়ণ নয়। তোমাদের অধ্যাপকদেব কাছে শুনেছি যে কোন কোন রাসায়নিক দ্রব্যের গুণ সন্ধান করতে একাধিক বৎসবের গবেষণা প্রয়োজন হয়। কিন্তু এইসব গ্রামবাসীর সন্ধান করবে কে ? তোমাদের গবেষণাগাবের কোন কোন গবেষণা কার্য যেমন চব্বিশ ঘণ্টাই চলে, তেমনি তোমাদের হৃদয়ের সুবিস্তীর্ণ অংশ যেন লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ব্যক্তির হিতকামনায় সদাই উষ্ণ থাকে।

"পথে ঘাটে বিচরণশীল সাধারণ মানুষেব তুলনায় তোমাদের কাছে আমি অনেক বেশী আশা করি। যেটুকু তোমরা করেছ, তাতে তৃপ্তি বোধ করে একথা বোলো না, 'আমরা যা পেরেছি, করেছি। এবার টেনিস কিংবা বিলিয়ার্ড খেলা যাক।' আমি বলব যে বিলিয়ার্ড খেলার ঘরে আর টেনিসের ময়দানে তোমাদেব নামে প্রতিদিন যে বিরাট ঋণের অঙ্ক চাপছে তার কথা স্মরণ করো। তবে ভিক্ষাব চাল আবার কাড়া-আকাড়া কি ? তোমরা আমাকে যা দিয়েছ, তার জন্য ধন্যবাদ জানাই। যে প্রার্থনা আমি জানালাম তার কথা ভেবো এবং তাকে কার্যান্বিত করার চেষ্টা করো। দরিদ্র রমণীরা তোমাদের জন্য যে বস্ত্র উৎপাদন করে, তা পরতে শঙ্কিত হয়ো না এবং খাদি পরিধান করার জন্য তোমাদের নিয়োগকর্তা যদি সিধা দরজা দেখিয়ে দেন, তাতে ভয় পেয়ো না। আমি চাই যে তোমরা মানুষের মত মানুষ হয়ে বিশ্বের সামনে নিজ বিশ্বাসের বলে অকম্পিত পদে দাঁড়াও। মূক জনগণের জন্য তোমাদের মনে যে উদ্যম আছে তা যেন অর্থের সন্ধানে নিষ্প্রভ না হয়। আমি বলছি যে জড়জগতে সংশ্লিষ্ট কোন পদার্থের গবেষণা বিনা শুধু আভ্যন্তরীণ (আভ্যন্তরীণ গবেষণা ছাড়া সব গবেষণাই তো নিষ্ফল) গবেষণার ফলে তোমরা এমন বেতার যন্ত্রের আবিষ্কার করতে পার, যা লক্ষ লক্ষ জনগণের

হৃদয়ের সঙ্গে তোমাদের হৃদয়ের সংযোগ স্থাপন করবে। তোমাদের সকল আবিষ্কারের লক্ষ্য যদি দরিদ্রের মঙ্গল সাধন না হয়, তাহলে রাজাগোপালাচারী ঠাট্টা করে যে কথা বলেছেন তাই সত্য হবে—তোমাদের এসব কর্মশালা শয়তানের কারখানার চেয়ে ভাল হবে না। যাক্, গবেষণায় নিযুক্ত ছাত্রদের যেমন মননশীল স্বভাবের হওয়া উচিত, সেরকম মানসিক স্থিতি যদি তোমাদের এতক্ষণ থেকে থাকে তাহলে বুঝবে আমি যথেষ্ট চিন্তার খোরাক দিয়েছি।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া—২১-৭-১৯২৭।

২৪। ছাত্রসমাজ ও গীতা

কয়েকদিন আগে জনৈক মিশনারী বন্ধুর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, ভারতবর্ষ যদি সত্য সত্যই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে অগ্রসর জাতি হয়, তবে অধিকাংশ ছাত্রেরই নিজ ধর্ম এবং এমন কি ভাগবদ্‌গীতার সম্বন্ধে জ্ঞান নেই কেন? বন্ধুটি স্বয়ং শিক্ষাব্রতী এবং নিজ বক্তব্যের সমর্থনে তিনি জানালেন যে নূতন ছাত্রদের সঙ্গে দেখা হলেই তিনি একথা জিজ্ঞাসা করেন যে, তাদের নিজ ধর্ম বা ভাগবদগীতা সম্বন্ধে জানা আছে কিনা? দেখা গেছে যে ছাত্রদের মধ্যে অধিকাংশই এ সম্বন্ধে অজ্ঞ।

কিছু সংখ্যক ছাত্রের নিজধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞান নেই বলে ভারত আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে অগ্রসর জাতি নয় বা ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে ছাত্রদের অজ্ঞতার অর্থ যাদের মধ্যে তারা বাস করে, সেই ভারতবাসীর ভিতর যাবতীয় ধর্মীয় ভাবনা ও আধ্যাত্মিকতার অভাব সূচক নয় ইত্যাদি যেসব সিদ্ধান্ত ঘটনা পূর্বোক্ত থেকে করা সম্ভব, এক্ষেত্রে আমি তার আলোচনা করব না। তবে এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সরকারী শিক্ষায়তনে যেসব ছাত্র আসে তাদের মধ্যে অধিকাংশই ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে সম্বন্ধ বিহীন। আমার মিশনারী বন্ধুটি মহীশূরের ছাত্রদের প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন এবং দেখে আমার দুঃখ হল যে মহীশূর রাজ্যের বিদ্যালয়গুলিতেও ছাত্ররা কোন ধর্ম শিক্ষা পায় না। আমি খবর রাখি যে একদল ব্যক্তি মনে করেন যে সর্বসাধারণের বিদ্যালয়ে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষাব্যবস্থা থাকা উচিত। এ কথাও আমি জানি যে, ভারতের মত যে দেশে প্রায় প্রত্যেকটি প্রচলিত ধর্মমত এবং তাদের শাখা প্রশাখা রয়েছে, সেখানে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করা কত কঠিন। কিন্তু ভারতকে যদি আধ্যাত্মিক দেউলিয়া বৃত্তি ঘোষণা না করতে হয়, তবে যুব সম্প্রদায়কে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া অন্তত ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা দেবার মত সমান গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বলে মনে

করতে হবে। একথা সত্য যে ধর্মপুস্তকের জ্ঞান আর ধর্ম—এ দুই এক জিনিস নয়। কিন্তু আমরা যদি ধর্ম শিক্ষা না-ই দিতে পারি তবে যেন অন্ততঃ আমাদের ছেলে-মেয়েদের তার চেয়ে আর একটু নীচের জিনিস—ধর্মগ্রন্থ সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে পারি। তবে বিদ্যালয়ে এ জাতীয় শিক্ষা দেওয়া হোক, বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্রদের কর্তব্য হচ্ছে অন্যান্য বিষয়ের মত ধর্ম সম্বন্ধে নিজ প্রচেষ্টায় জ্ঞানার্জন করা। বিতর্ক সভা বা আজকাল যে সুতাকাটার বর্গ চলছে, তারা তার অনুকরণে এ রকম বর্গ নিজেদের জন্য চালাবে।

শিমোগা কলেজিয়েট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে, শতাধিক হিন্দু ছাত্রের মধ্যে খুব বেশী হলে আটজন মাত্র ভাগবদগীতা পড়েছে। যে কয়জন গীতা পড়েছে, তাদের মধ্যে কেউ গীতাব অর্থ বুঝেছে কিনা এ প্রশ্ন কবা হলে কেউ হাতই তুললো না। পবিত্র কোরান পড়েছে কিনা জানতে চাওয়ায় পাঁচ-ছয় জন মুসলমান ছাত্রেব মধ্যে প্রত্যেকেই হাত তুলেছিল। তবে একজন মাত্র বলেছিল যে সে এব অর্থ বোঝে। আমার মতে গীতার অর্থ বোঝা খুবই সহজ। এতে অবশ্য এমন কতকগুলি মৌলিক সমস্যার উল্লেখ পাওয়া যায়, যা সমাধান কবা নিঃসংশয়ে কঠিন। তবে আমাব মতে গীতার সাধারণ ভাবধারা গ্রহণ করতে খুব বেশী পরিশ্রমেব প্রযোজন হয় না। হিন্দুধর্মেব অন্তর্গত প্রত্যেকটি সম্প্রদায় একে প্রামাণ্য বলে বিবেচনা করেন। গীতা যাবতীয় গোঁড়ামির স্পর্শ মুক্ত। এতে সংক্ষিপ্ত আয়তনেব ভিতর পূর্ণাঙ্গ যুক্তিসঙ্গত নৈতিক বিধান পাওয়া যায়। বুদ্ধি এবং হৃদয় উভয়েরই এ সন্তোষ বিধান করে। সেইজন্য একে দার্শনিক ও ভক্তিমূলক দুই বলা চলে। এব আবেদন সার্বিক। এর ভাষা অতীব সরল। তবে এর সঙ্গে সঙ্গে আমি মনে করি যে ভারতের প্রত্যেকটি কথ্য ভাষায় এর প্রামাণ্য অনুবাদ প্রকাশিত হওয়া উচিত এবং অনুবাদ কার্য যেন জটিলতা দোষমুক্ত হয়। অনুবাদ যেন এমন হয় যে সাধারণ মানুষকে গীতা পড়ানো সহজসাধ্য হয়। তবে অনুবাদকে মূলের স্থলাভিষিক্ত করার জন্য এ প্রস্তাব নয়। কারণ আমি আমার অভিমতের পুনরুক্তি কবতে চাই যে প্রতিটি হিন্দু বালক-বালিকার সংস্কৃত শেখা উচিত। কিন্তু আগামী বহুদিন পর্যন্ত এমন অনেকে থাকবে, যারা সংস্কৃত জানবে না। শুধু সংস্কৃত না জানার অপরাধে তাদের ভাগবদগীতার জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে রাখা আত্মহত্যার সামিল হবে।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—২৫-৮-১৯২৭।

২৫। ছাত্রদের অংশ *

টাকার থলির অর্থ

আমি জানি যে আমার বহু বিশিষ্ট ও জ্ঞানী দেশবাসী এই বলে চরকার দাবীকে নস্যাৎ করেছেন—যে ছোট্ট চরকাটিকে আমাদের মাতা ও ভগ্নী সমাজ হাসিমুখে বাতিল করে দিয়েছেন, তা দিয়ে কখনও স্বরাজ অর্জিত হতে পারে না। তথাপি তোমরা আমার দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছ এবং আমি এতে অত্যন্ত সুখী হয়েছি। তোমরা ছাত্ররা এ সম্বন্ধে অভিনন্দনপত্রে খুব বেশী না বললেও যা বলেছ তাতে এ কথার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে চরকা তোমাদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন পরিগ্রহ করেছে। সুতরাং এই টাকার থলিই তোমাদের চরকা-প্রীতির প্রথম ও শেষ নিদর্শন যেন না হয়। এ যদি তোমাদের ভালবাসার শেষ চিহ্ন হয় তবে তোমাদের বলে রাখছি যে আমার পক্ষে এ বড় অস্বস্তিকর বোধ হবে। কারণ এই টাকা বুভুক্ষু জনসাধারণের মধ্যে বণ্টন করে যে খাদি উৎপাদন করা হবে তা যদি তোমরা না ব্যবহার কর, তাহলে এ টাকার আমি সদ্ব্যয় করতে পারব না। সত্যিকথা বলতে গেলে চরকার প্রতি মৌখিক বিশ্বাস জ্ঞাপন করে কতকটা পিঠ চাপড়ানো গোছের মনোভাব নিয়ে আমার দিকে কয়েকটি টাকা ছুঁড়ে দিলে না আসবে স্বরাজ আর না হবে বুভুক্ষু ও মেহনতী ·জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যরূপী সমস্যার সমাধান। একটু ভুল হয়ে গেছে। আমি মেহনতী জনসাধারণ বলেছি। বিবরণটা সত্য হলে ভাল ছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ পরিচ্ছদ সম্বন্ধীয় আমাদের দৃষ্টিকোণের পরিবর্তন না করায় সারা বছর এই বুভুক্ষু জনসাধারণের মেহনত করার রাস্তা আমরা বন্ধ করে দিয়েছি। তাদের উপর আমরা এমন একটা অবকাশের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছি যা কিনা বছরে চার মাস অন্ততঃ তারা চায় না। এ কথা আমার উর্বর মস্তিষ্কপ্রসূত কল্পনা নয়। এই জনগণের ভিতর তোমাদের যে স্বদেশবাসী গভীরভাবে মিশেছে তার কথা বাতিল করলেও আমি বলব যে বহু ব্রিটিশ শাসক এই সত্যের পুনরাবৃত্তি করেছেন। সুতরাং এই টাকার থলি নিয়ে অনশনরতা ভগ্নীদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে সমস্যার সমাধান হবে না। পক্ষান্তরে এতে তাদের আত্মার দৈন্য সৃষ্টি করা হবে। তারা ভিক্ষুকে পরিণত হয়ে দয়ার দানে জীবনধারণের স্বভাব প্রাপ্ত হবে। যে দেশ বা ব্যক্তিকে ভিক্ষায় জীবন নির্বাহ করতে হয়, তাদের যেন ভগবান দয়া করেন।

* মাদ্রাজের পাচিয়াপ্পা কলেজে প্রদত্ত বক্তৃতা।

তোমাদের বা আমার কর্তব্য হচ্ছে আমাদের এইসব ভগ্নীরা যাতে নিজ গৃহে সুরক্ষিত অবস্থায় থেকে কাজ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা এবং চরকা চালানো ছাড়া এ জাতীয় আর কি কাজ হতে পারে? এ পেশা মর্যাদাকর ও সৎ এবং এটা কাজের মত কাজ। তোমাদের কাছে এক আনা পয়সার হয়ত কোন মূল্য নেই। দুই, তিন, চার বা পাঁচ মাইল হেঁটে খানিকটা ব্যায়াম করার বদলে তোমরা হয়ত এক আনা ফেলে দিয়ে ট্রামে বসে সময়টা আলস্যভরে কাটিয়ে দেবে। কিন্তু এই আনিটি যখন কোন দরিদ্র ভগ্নীর হাতে পড়ে তখন এ সার্থক হয়ে ওঠে। এর জন্য সে পরিশ্রম করে ও এব বিনিময়ে সে আমাকে তার নিষ্কলঙ্ক হাতে কাটা সুতা দেয় এবং এই সুতার পিছনে ইতিহাস রয়েছে। এ সুতা রাজা-রাজড়াদের পরিচ্ছদে পরিণত হবার মর্যাদাব অধিকারী। কলের কাপড়ের এ ঐতিহ্য নেই। আমাব কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার প্রায় সর্বক্ষণের কার্য হওয়া সত্ত্বেও একটিমাত্র বিষয়ে আমি তোমাদের আর আবদ্ধ রাখব না। তোমরা যদি অন্তত অতঃপব (অবশ্য ইতিপূর্বেই যদি এ সংকল্প না নিয়ে থাক) খাদি ছাড়া অন্য কিছু না পরাব আদর্শে দৃঢ়সংকল্প না হও, তবে তোমাদের এই টাকার থলি আমার কাজে সহায়ক হবার বদলে বাধা হবে।

ব্রাহ্মণত্ব না পশুত্ব

তোমরা বাল্য বিবাহ ও বালবিধবাদের কথা উল্লেখ করেছ। জনৈক জ্ঞানী তামিল ভদ্রলোক আমার কাছে এই মর্মে অনুরোধ জানিয়েছেন যে এই বালবিধবাদের সম্বন্ধে তিনি ছাত্রদের কিছু বলতে চান। তিনি জানিয়েছেন যে এই প্রদেশেব বালবিধবাদের ভারতের চতুষ্পার্শে অন্য সকল এলাকার বালবিধবাদের চেয়ে অনেক বেশী কষ্ট সহ্য করতে হয়। একথার সত্যাসত্য নির্ধারণ করার অবকাশ আমার ঘটেনি। এসম্বন্ধে তোমরা আমার চেয়ে ভাল জান। আমার চতুষ্পার্শে এই যে তোমরা যুবকের দল রয়েছ, আমি চাই যে তোমাদের নিজেদের প্রতি আচরণ আর একটু সৌজন্যমূলক হোক। এতে তোমবা রাজি হলে আমার একটি ভাল প্রস্তাব আছে। আমার মনে হয় তোমাদের মধ্যে অনেকেই অবিবাহিত এবং অনেকে হয়ত ব্রহ্মচর্যের সংকল্প গ্রহণ করেছ। "অনেকে হয়ত" কথাটি আমি এইজন্য বললাম যে, ছাত্রদের আমি জানি এবং যে ছাত্র তার ভগ্নীর প্রতি কামনা-লোলুপ দৃষ্টিক্ষেপ করে, সে ব্রহ্মচারী নয়। তোমরা এই পবিত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর যে তোমরা বিধবা ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না এবং বিবাহযোগ্যা কোন বিধবা পাত্রী না-পেলে অবিবাহিত থাকবে। এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে সমগ্র বিশ্বে এ সিদ্ধান্তের কথা

ঘোষণা কর। পিতামাতা জীবিত থাকলে তাঁদের একথা জানাও এবং নিজের বোনদেরও এর কথা বল। কথাটা আমি 'বিধবা' বললাম বটে; কিন্তু তা ঠিক নয়। কারণ আমি মনে করি যে দশ-পনের বছরের যে মেয়েটির তথাকথিত বিবাহ সম্বন্ধে অভিমত জ্ঞাপনের সুযোগ ছিল না এবং বিবাহের পর যে হয়ত কোনদিন তথাকথিত স্বামীর সঙ্গে বাস করেনি, তাকে অকস্মাৎ একদিন বিধবা বলে ঘোষণা করলেই সে বিধবা হয়ে যায় না। এরকম মেয়েকে বিধবা আখ্যা দেওয়া এই শব্দটির অপপ্রয়োগ এবং ভাষা ও যা কিছু পবিত্র—তার দুরুপযোগ। হিন্দুধর্মে "বিধবা" কথাটির এক পবিত্র তাৎপর্য আছে। পরলোকগতা শ্রীমতী রামাভাই রাণাড়ের মত বিধবা যাঁরা "বিধবা" কথাটির অর্থ জানেন, তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু নয় বৎসর বয়স্ক একটি শিশু স্বামীর সম্বন্ধে কিছুই জানে না। এ প্রদেশে যদি অবশ্য এই ধরণের বিধবা না থেকে থাকে তাহলে আমার কথা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। কিন্তু এখানে যদি এইরকম বালবিধবার অস্তিত্ব থাকে, তাহলে এ অভিশাপ থেকে মুক্তি পেতে হলে পূর্বোক্ত সংকল্প গ্রহণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আমার মধ্যে এইটুকু গোঁড়ামি আছে যে আমি বিশ্বাস করি যে জাতির এই জাতীয় পাপের প্রতিক্রিয়া স্থূল বস্তুর উপর পড়ে। আমি বিশ্বাস করি যে এই জাতীয় পাপের একত্র সমাবেশের ফলেই আজ আমরা পরাধীন। হাউস অফ কমন্স থেকে হয়ত বিড়ালের ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ার মত দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা শাসনতন্ত্র তোমরা পেতে পার। কিন্তু এ শাসনতন্ত্রকে রূপ দেবার উপযুক্ত নরনারী দেশে পাওয়া না গেলে এসব নিষ্প্রয়োজন সাবুদ হবে। দেশে যতদিন এমন একজনও বিধবা থাকবে, যে তার মৌলিক অধিকার পূর্তির জন্য আগ্রহশীল অথচ বলপ্রয়োগে তাকে বাধা দেওয়া হচ্ছে, ততদিন কি করে তোমরা আশা কর যে আমরা ত্রিশ কোটী লোকের এই জাতির শাসনভার বহন করতে পারি বা এর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করতে সমর্থ? এর নাম ধর্ম নয়—অধর্ম। হিন্দুধর্মে জারিত হওয়া সত্ত্বেও আমি একথা বলছি। তোমরা যেন এ ভুল করো না যে পাশ্চাত্য প্রভাব আমাকে দিয়ে একথা বলাচ্ছে। আমি দাবী করি যে আমার মধ্যে নির্ভেজাল ভারতীয়ত্বের ধারা উপচে পড়ছে। পাশ্চাত্য জগতের অনেক কিছু আমি নিজের করে গ্রহণ করলেও এ বিষয়টি গ্রহণ করিনি। হিন্দুধর্মে এ জাতীয় বৈধব্যের কোন সমর্থন নেই।

বালবিধবাদের সম্বন্ধে আমি যা কিছু বলেছি, স্বভাবতই তা অপরিণত বয়স্কা স্ত্রীদের প্রতিও প্রযোজ্য। তোমরা নিজেদের বাসনার অন্তত এতটুকু নিয়ন্ত্রণ করবে যে ১৬ বছরের কম বয়সের কোন মেয়েকে বিয়ে করবে না। আমার হাতে ক্ষমতা থাকলে আমি মেয়েদের সর্বনিম্ন বিবাহযোগ্য বয়স ২০ বলে নির্ধারণ করতাম।

এমন কি ভারতে কুড়ি বছর বয়সটাও যথেষ্ট তাড়াতাড়ি হয় বলতে হবে। মেয়েদের অকাল বার্ধক্যের জন্য দায়ী আমরাই, ভারতের আবহাওয়া নয়। কারণ আমি কুড়ি বছর বয়সের এমন অনেক মেয়েদের জানি, যারা পবিত্র ও সারল্যের প্রতিমূর্তি স্বরূপ এবং তারা চতুর্দিকের লোলুপ-কামনার নিশ্বাস-ঝটিকার সম্মুখে আত্মরক্ষায় সক্ষম। অসময়ে মেয়েদের প্রবীণা করে দেবার দায়িত্ব আমরা যেন সযত্নে বুকে আঁকড়ে না ধরে থাকি। অনেক ব্রাহ্মণ ছাত্র আমাকে বলে যে তাদের পক্ষে এ আদর্শ অনুসরণ করা সম্ভবপর নয়। কারণ ব্রাহ্মণ কন্যারা দশ থেকে বারো-তেরো বছর বয়সের মধ্যে পাত্রস্থ হয়ে যায় ও কদাচিৎ কোন ব্রাহ্মণ ষোল বছর পর্যন্ত নিজ কন্যাকে অবিবাহিত রাখে বলে ও বয়সের পাত্রী পাওয়া অসম্ভব। এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ যুবকদের প্রতি আমার বক্তব্য হচ্ছে, নিজেকে সংযত করতে না পারলে ব্রাহ্মণত্ব বিসর্জন দাও। ষোল বছরের প্রাপ্তবয়স্কা বালবিধবা কোন পাত্রী নির্বাচন করো। এ বয়সের ব্রাহ্মণ বংশজাত বালবিধবা না পেলে যে কোন জাতের মেয়েকে বিয়ে কর। আমি তোমাদের বলে দিচ্ছি যে বারো বছরের একটি বালিকার উপর বলপ্রয়োগ করার বদলে কোন ছেলে যদি জাতির বাইরে বিবাহ করে, তাহলে হিন্দুদের যাবতীয় দেব-দেবী তাকে নিশ্চয় ক্ষমা করবেন। তোমাদের হৃদয় পবিত্র না হলে এবং তোমরা নিজ কামনা-বাসনাকে সংযত করতে সমর্থ না হলে কিছুতেই শিক্ষিত আখ্যা পেতে পার না। নিজ প্রতিষ্ঠানকে তোমরা প্রমুখ আখ্যায় ভূষিত করেছ। আমি চাই যে তোমরা প্রমুখ প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত ছাত্ররূপে চরিত্রবলে মহীয়ান হয়ে বিশ্বে বিচরণ কর। আর চরিত্র গঠন ছাড়া শিক্ষার মূল্য কি এবং প্রাথমিক ব্যক্তিগত শুচিতা ছাড়া চরিত্রেরই বা মূল্য কি? ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে আমি গভীর শ্রদ্ধা করি। বর্ণাশ্রম ধর্মের পক্ষ নিয়ে আমি বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে সংগ্রাম করেছি। কিন্তু যে ব্রাহ্মণত্ব অস্পৃশ্যতা, কুমারীর বৈধব্য এবং শিশু সরল কুমারীর উপর নিপীড়ন সমর্থন করে, তা আমার নাসারন্ধ্রে দুর্গন্ধ বিতরণ করে। এ হচ্ছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যঙ্গ। এর ভিতর ব্রহ্ম জ্ঞানের তিলমাত্র নেই। শাস্ত্র গ্রন্থরাজির সঠিক ব্যাখ্যাও এ নয়। এর নাম নিছক পশুপ্রবৃত্তি। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের উপাদান এর চেয়ে অনেক কঠিন। আমি চাই যে আমার এই কথাকটি তোমাদের অন্তরের অন্তস্থলে গিয়ে পৌছাক।

ধূমপানের উপকারিতা

কালিকটের জনৈক অধ্যাপকের অনুরোধক্রমে আমি এবার সিগারেট সেবন এবং চা ও কফি পান সম্বন্ধে কিছু বলব। এগুলি জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয়

নয়। এমন অনেকে আছে যারা দিনে দশ পেয়ালা কফি খায়। তাদের স্বাস্থ্যের সুষ্ঠু বিকাশ এবং কাজের খাতিরে জাগরিত রাখার জন্য কি এটা অপরিহার্য ? জেগে থাকার জন্য যদি তাদের চা বা কফি পান করা অপরিহার্য বোধ হয়, তাহলে তাদের রাত না জেগে শুয়ে পড়াই ভাল। আমরা যেন এ সবের ক্রীতদাসে পরিণত না হই। কিন্তু চা বা কফি পানকারীদের মধ্যে অধিকাংশই এর দাস। চুরুট ও সিগারেট দেশী বা বিদেশী যাই হোক না কেন, তার থেকে দূরে থাকতে হবে। সিগারেট সেবন করা কতকটা আফিং খাওয়ার মত এবং যে চুরুট তোমরা খাও তাতে সামান্য মাত্রায় আফিং মেশানো থাকেও। এর প্রভাব তোমাদের স্নায়ুতন্ত্রীর উপর পড়ে এবং পরে এ আর তোমরা ছাড়তে পার না। একজন ছাত্র কি করে তার মুখকে চিমনীতে রূপান্তরিত করে কলুষিত করে! এইসব চুরুট, সিগারেট, চা ও কফির অভ্যাস বর্জন করলে দেখবে তোমাদের কতটা সাশ্রয় হচ্ছে। টলস্টয়ের একটি গল্পে আছে যে একজন মাতাল ধূমপান না করা পর্যন্ত খুন করতে ইতস্ততঃ করছিল। কিন্তু মুখ দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ার পরই সে সহাস্য বদনে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আরে, আমি কি ভীরু!" আর তারপরই ছুরি নিয়ে নিজ কার্য সাধন করল। টলস্টয়ের এ বর্ণনা অভিজ্ঞতালব্ধ। তাঁর যাবতীয় রচনার ভিত্তি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। তিনি মদ্যপান করার চেয়েও ধূমপানের অধিকতর বিরোধী। তবে তোমরা যেন এই ভুল করো না যে মদ্যপান এবং ধূমপানের ভিতর মদ্যপান অপেক্ষাকৃত কম হানিকর। সিগারেট যদি বেলজিবাব (জনৈক নরকদূত) হয়, তবে মদ হচ্ছে শয়তান।

হিন্দী

এরপর হিন্দীর কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন : উত্তর ভারতে জনসাধারণের সমর্থনে হিন্দী প্রচার দপ্তর চলছে। তারা প্রায় লাখখানেক টাকা খরচ করেছেন এবং হিন্দী শিক্ষকরা নিয়মিতভাবে নিজ কর্তব্য করে যাচ্ছেন। কথঞ্চিৎ অগ্রগতি হলেও এ বিষয়ে আরও উন্নতির অবকাশ আছে। দৈনিক একঘণ্টা সময় দিলে এক বছরের মধ্যে তোমরা হিন্দী শিখে যাবে সাধারণ হিন্দী তোমরা ছয় মাসের মধ্যে বুঝতে পারবে। তোমাদের সঙ্গে আমি হিন্দীতে কথা বলতে পারছি না; কারণ তোমাদের মধ্যে অনেকেই এ ভাষা জান না। ভারতবর্ষে হিন্দীকে সর্বসাধারণের ভাষায় পরিণত করতে হবে। তোমাদের সংস্কৃতও শেখা উচিত। তাহলে ভাগবদগীতা পড়তে পারবে। একটি প্রমুখ হিন্দু প্রতিষ্ঠানের ছাত্র হিসাবে তোমাদের ভাগবদগীতা শেখা উচিত। আমি চাই যে মুসলমান ছাত্ররাও এ

প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করুক। (একটি কণ্ঠস্বর: এখানে পঞ্চমদের স্থান নেই) একথা আমি নূতন শুনলাম। এ প্রতিষ্ঠানের দ্বার পঞ্চম এবং মুসলমানদের কাছে খুলে দিতে হবে। এ প্রতিষ্ঠানে পঞ্চমরা প্রবেশাধিকার না পেলে আমি এর হিন্দুত্ব ঘুচাব। (হর্ষধ্বনি) এটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান বলে পঞ্চম বা মুসলমানরা যে এখানে শিক্ষা পাবে না, এর কোন যৌক্তিকতা নেই। আমার মতে ট্রাস্টিদের সামনে এই প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলীর সংশোধন করার সময় এসে গেছে। আমি একজন নিষ্ঠাবান ও ঈশ্বরবিশ্বাসী হিন্দু এবং হিন্দুধর্মের নীতিতে প্লাবিত। আমি হিন্দুধর্মের কোন কেউকেটা ধরণের সংস্কারক নই। হিন্দুধর্মের সেরা যা, তাই অবলম্বন করে আমি চলার চেষ্টা করছি। এই আমি আজ অনুরোধ জানাচ্ছি যে এ প্রতিষ্ঠানের নিয়মাবলীর সংশোধন করা হোক। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি দয়া করে এই অনুরোধ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করবেন এবং এই প্রদেশে আমার সাময়িক উপস্থিতি কালের মধ্যেই যদি খবর পাই যে আমার আবেদন ফলপ্রসূ হয়েছে, তাহলে আমি অত্যন্ত প্রীত হব।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—১৫-৯-১৯২৭।

২৬। সবেদন প্রতিবাদ

একটি বাঙলা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লিখছেন:

"মাদ্রাজের ছাত্রদের আপনি যে শুধু বিধবা বিবাহ করার উপদেশ দিয়েছেন, তাতে আমরা আতঙ্কিত হয়েছি। আমি আপনার বক্তব্যের বিনম্র অথচ সবেদন প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি।

"এই জাতীয় উপদেশের ফলে বিধবাদের আজীবন ব্রহ্মচর্য পালন করে এক জন্মে মুক্তি পাবার প্রবৃত্তি শিথিল হবে। অথচ এই কারণেই ভারতীয় নারীর স্থান বিশ্বে অনন্য। আপনার উপদেশের ফলে তারা ঐহিক ভোগ বিলাসের পুঁতিগন্ধময় পথে নিক্ষিপ্ত হবে। বিধবাদের জন্য এই জাতীয় গভীর সহানুভূতি তাদের অহিত সাধন করবে এবং যেসব কুমারীদের পাত্রস্থ করা এমনিতেই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তাদের প্রতিও অবিচার করা হবে। আপনার বিবাহ সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত হিন্দুদের জন্মান্তর, পুনর্জন্ম এবং এমন কি মুক্তি সম্বন্ধীয় বিশ্বাসের মূলোৎপাটন করে হিন্দু সমাজকে অবাঞ্ছনীয়রূপে অন্যান্য সমাজের সমপর্যায়ে টেনে নামাবে। আমাদের সমাজেও অবশ্য দুর্নীতির সঞ্চার ঘটেছে। কিন্তু আমাদের হিন্দু আদর্শের প্রতি দৃষ্টি দৃঢ়নিবদ্ধ রাখতে হবে এবং যথাসম্ভব উচ্চে ওঠার প্রচেষ্টা করতে হবে। অন্য কোন

সমাজ বা আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হলে চলবে না। অহল্যাবাঈ, রাণী ভবানী, বেহুলা, সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী আদির উদাহরণ হিন্দু সমাজকে পরিচালিত করবে এবং আমাদেরও কাজ হবে সমাজকে তাঁদের আদর্শে পরিচালিত করা। এই কারণে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে এইসব জটিল বিষয়ে অভিমত প্রকাশ করা থেকে আপনি বিরত থাকুন এবং সমাজকে যথা অভিরুচি চলতে দিন।"

এই সবেদন প্রতিবাদে আমার মত পরিবর্তন হয়নি বা আমি অনুতপ্তও বোধ করছি না। ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে সচেতন এবং নিজ ইচ্ছাদ্বারা পরিচালিত ও সেপথে চলতে দৃঢ়সঙ্কল্প একজনও বিধবা আমার উপদেশে নিজ পথ বর্জন করবে না। তবে আমার উপদেশ অনুসৃত হলে যেসব অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা বিবাহানুষ্ঠানের সময় বিবাহের বিন্দুমাত্র তাৎপর্য উপলব্ধি করেনি, তারা প্রাণে বেঁচে যাবে। তাদের ক্ষেত্রে 'বিধবা' কথাটি ব্যবহার করা অর্থ একটি পবিত্র শব্দের উৎকট অপপ্রয়োগ মাত্র। সত্য কথা বলতে কি পত্রলেখকের মনোগত ভাবের সম্মানার্থই আমি দেশের যুবকদের পরামর্শ দিয়েছি যে হয় তারা এইসব তথাকথিত বিধবাদের বিবাহ করবে, নয় চিরকুমার থেকে যাবে। এ প্রথার পবিত্রতা তখনই রক্ষিত হবে, যখন বালবিধবাদের এর আওতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে।

অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে যে ব্রহ্মচর্য পালন করলে বিধবাদের যে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়—এ কথাটি ভিত্তিহীন। এই চরম আশীর্বাদ অর্জন করতে হলে ব্রহ্মচর্য ছাড়া আরও অনেক কিছু প্রয়োজন। আর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া ব্রহ্মচর্যের কোন মূল্য নেই। বরং বহু ক্ষেত্রে এর ফলে সমাজে গোপন দুর্নীতির প্রসার হয়। পত্র-লেখক যেন অবগত থাকেন যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি এ কথা লিখছি।

আমার উপদেশের ফলে কুমারী বিধবাদের প্রতি যদি প্রাথমিক ন্যায় বিচার করা হয়, তাহলে আমি সত্য সত্যই সুখী হব এবং এর ফলে যদি অন্যান্য কুমারীরা অকালে পুরুষের কামনা-বহ্নির ইন্ধনে পরিণত না হয়ে বয়স ও জ্ঞানের দিক থেকে পরিণত হবার অবকাশ পায়, আমি তাতে আনন্দিত হব।

আমি বিবাহ সম্বন্ধে এমন কোন সিদ্ধান্ত প্রচার করিনি, যা পুনর্জন্ম, জন্মান্তর বা মুক্তির প্রতিকূল। পাঠকদের বোধহয় জানা আছে যে, যেসব লক্ষ লক্ষ হিন্দুকে আমরা আক্রোশবশতঃ নীচ জাতীয় বলে আখ্যা দিই, তাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে কোন বাধা নেই। প্রবীণ বয়স্কা বিধবাদের পুনর্বিবাহের কথা যদি না ওঠে, তাহলে ভ্রমবশতঃ যাদের বিধবা আখ্যা দেওয়া হয়েছে, তাদের সত্যকার বিবাহ কি করে যে সেই মহান মুক্তির বিশ্বাসের পথের বাধা হতে পারে, একথা বুঝতে আমি অক্ষম। পত্রলেখক একথা জেনে বোধ হয় আনন্দিত হবেন যে আমার কাছে

জন্মান্তর বা পুনর্জন্ম শুধু সিদ্ধান্ত নয়, প্রাত্যহিক সূর্যোদয়ের মত আমার কাছে এ এক প্রত্যক্ষ ঘটনা। মুক্তি-উপলব্ধিসিদ্ধ ব্যাপার এবং সর্বশক্তি প্রয়োগে আমি এর জন্য চেষ্টা করছি। কুমারী বিধবাদের প্রতি যে নিদারুণ অবিচার হচ্ছে তার প্রতি আমাকে সচেতন করে তুলেছে মুক্তির এই অপরিসীম অনুভূতি। আমরা যেন দুর্বলতা তাড়িত হয়ে আধুনিক যুগের নিপীড়িতা কুমারী বিধবাদের সঙ্গে এক নিশ্বাসে পত্রলেখক কর্তৃক উল্লিখিত সীতাদেবী ইত্যাদির অমর নামোচ্চারণ না করি।

পরিশেষে আমি বলব যে হিন্দুধর্মে সত্যকারের বৈধব্য ব্রতের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ভাবে মর্যাদা আরোপিত হলেও আমি যতদূর জানি বিধবাদের পুনর্বিবাহ নিষিদ্ধ করার স্বপক্ষে বৈদিকযুগে কোন সমর্থন ছিল না। তবে আমার জেহাদ সত্যকার বৈধব্য ব্রতের বিরুদ্ধে নয়। এর মারাত্মক ব্যঙ্গের বিরুদ্ধেই আমার সংগ্রাম। সেরা উপায় হচ্ছে এই যে আমি যেসব মেয়েদের কথা বলছি, তাদের বিধবা বলেই মনে না করা। যেসব হিন্দুর মধ্যে বিন্দুমাত্র সৌজন্য বোধ আছে, তাঁরা এই সব মেয়েদের এই অসহ্য বোঝার ভার থেকে নিশ্চয় মুক্তি দেবেন। সুতরাং যথোচিত বিনয় সহকারে সরবে আমি আবার আমার বক্তব্যের পুনরুক্তি করছি যে প্রত্যেক হিন্দু যুবকের কর্তব্য হচ্ছে ভ্রমবশতঃ যেসব কুমারীদের বিধবা বলা হয়, তাদের ছাড়া আর কাউকে বিবাহ না করা।

ইয়ং ইণ্ডিয়া—৬-১০-১৯২৭।

২৭। তিরুপুরের বক্তৃতা *

"ভক্তিভাবে গীতা পাঠ করার চেয়ে আর কোন শ্রেয়তর জীবন রসায়ন আছে বলে আমি জানি না। ছাত্ররা যেন এই কথা খেয়াল রাখে যে তাদের সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানের পরিচয় দান বা এমন কি গীতার জ্ঞানের বহর দেখাবার জন্য ভাগবদ্গীতা পাঠের প্রয়োজনীয়তা ঘটছে না, গীতার প্রয়োজন আধ্যাত্মিক প্রশান্তির জন্য এবং নৈতিক ধর্মসংকটে পথ খুঁজে পাবার জন্য। যে কেউ সশ্রদ্ধচিত্তে এই গ্রন্থ অধ্যয়ন করুক, তাকে এর ফলে জাতি এবং এর মারফত সমগ্র মানব সমাজের সাঁচ্চা সেবক হতেই হবে।" ঘটনাচক্রের বিচিত্র আবর্তে সৌভাগ্যক্রমে বাঙ্গালোরের মত আজকের এই দিনটিও রবিবার এবং এইদিনে সেবা ও কর্মের এষণাদ্যোতক গীতার তৃতীয় অধ্যায় পাঠ করার বিধি। ছাত্রদের আশীর্বাদ করণান্তর গান্ধীজী বললেন, "গীতায় কর্ম, ভক্তি, জ্ঞান এই ত্রিবিধ বাণী বিদ্যমান। জীবন হবে এই ত্রিযোগের

* তিরুপুর উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমক্ষে প্রদত্ত বক্তৃতা হইতে

স্বষ্ঠু সমন্বয়। তবে সেবার বাণীই হবে সব কিছুর ভিত্তি এবং জাতির সেবায় আত্ম-নিয়োগেচ্ছুকদের কাছে কর্মযোগের অধ্যায় দিয়ে গীতা স্বরু করার চেয়ে কাম্য আর কি হতে পারে ? তবে অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ ও অস্তেয় এই পঞ্চায়ুধে সজ্জিত হয়ে তোমাদের এর দিকে অগ্রসর হতে হবে। শুধু তাহ'লেই তোমরা এর সঠিক ব্যাখ্যা করতে সমর্থ হবে। আর তবেই তোমরা গীতা পাঠে অহিংসার আবিষ্কার করবে, হিংসা নয়। আজ অনেকে এর ভিতর শুধু হিংসাই দেখার চেষ্টা করেন। প্রয়োজনীয় গুণ সমন্বিত হয়ে গীতা অধ্যয়ন কর এবং আমি তোমাদের কাছে বচনবদ্ধ হচ্ছি যে এর ফলে তোমরা মনোরাজ্যে এমন এক শান্তির উৎসের সন্ধান পাবে, যার সমাচার ইতিপূর্বে অবিদিত ছিল।"

ইয়ং ইণ্ডিয়া ৩-১১-১৯২৭

২৮। ব্যক্তিগত শুচিতার স্বপক্ষে *

একটু পূর্বেই ট্রিনিটি কলেজের ছাত্রদের আমি যা বলেছি তার পুনরুক্তি করে বলব যে, সত্য ও শুচিতার সুদৃঢ় বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে তোমাদের শিক্ষা একেবারে মূল্যহীন। তোমবা ছেলেব দল যদি ব্যক্তিগত জীবনের পবিত্রতার দিকে দৃষ্টি না দাও এবং তোমাদের চিন্তায়, বচনে ও কর্মে যদি শুচিতার পরশ না লাগে, তাহলে পাণ্ডিত্যের আকর হলেও তোমরা শেষ হয়ে গেছ বলতে হবে।

একটি বিষয়ের প্রতি তোমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আমাকে বলা হয়েছে। শুচিতার প্রথম সোপান হচ্ছে পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী হওয়া। তবে একথাও ঠিক যে বাহ্য ক্রিয়াকলাপ ও আচার ব্যবহারে মনের কথা বেরিয়ে আসেই। যে ছেলেটি নিজের মুখ পবিত্র রাখতে চায় তার কু-কথা উচ্চারণ করা চলবে না। কথাটা অবশ্য অতীব প্রাঞ্জল। এতদ্ব্যতিরেকে এমন কোন জিনিস সে মুখে দেবে না, যা কিনা তার বুদ্ধিবৃত্তি এবং মনকে আচ্ছন্ন করতে পারে এবং যা তার বন্ধুদের ক্ষতি করবে।

আমি জানি যে অনেক ছেলে ধূমপান করে। ধূমপানের এই কদভ্যাসের কথা বিবেচনা করতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে সর্বত্র ছেলেদের অবনতি হচ্ছে। তবে সিংহলের তোমরা বোধ হয় এদিক দিয়ে ব্রহ্মদেশের ছেলেদেরই মত খারাপ। আর তোমরা জান যে পার্শীদের অগ্নি-উপাসক বলা হয়। ভগবানকে তারা অগ্নির দেবাদিদেব সূর্যরূপী মহান পাবকের মাধ্যমে দেখলে কি হবে, তারা তোমাদের চেয়ে বড় অগ্নিপূজক নয়।

* ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর ক্যাণ্ডিস্থ ধর্মরাজ কলেজে প্রদত্ত অভিভাষণ

পার্শীদের মধ্যে তোমরা অনেকে ধূমপান কর না এবং তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণে কিছু ছেলে থাকলে তোমাদের নিরন্তর প্রচেষ্টা হয় যাতে তারা ধূম্রজালে মুখমণ্ডল কলঙ্কিত না করে তার প্রতি দৃষ্টি রাখা।

তোমাদের মধ্যে কেউ যদি ধূমপান কর, তবে অতঃপর এ বদভ্যাস পরিহার করবে। ধূমপানে শ্বাসপ্রশ্বাস কলুষিত হয়। অভ্যাসটি বিরক্তিকরও বটে। রেলের কামরায় উপবেশনকালীন ধূমপায়ী এ বিষয়ের প্রতি ভ্রূক্ষেপই করে না যে গাড়ীতে অন্য যেসব ধূমপানে অনভ্যস্ত মহিলা বা পুরুষ রয়েছেন, তাদের পক্ষে তার মুখ-নিসৃত দুর্গন্ধ বিরক্তির কারণ হয়।

দূর থেকে সিগারেট জিনিসটিকে ছোট্ট মনে হতে পারে। কিন্তু এর ধোঁয়া যখন মুখের ভিতরে ঢুকে বেরিয়ে আসে, তখন সে হয়ে ওঠে বিষ। ধূমপায়ীদের খেয়াল থাকে না যে তারা কোথায় থুথু ফেলছে। অতঃপর গান্ধীজী টলস্টয় লিখিত একটি গল্পের উল্লেখ করলেন, যাতে দেখানো হয়েছে যে তাম্রকূট সেবনের প্রতিক্রিয়া মদ্যপানের চেয়েও মারাত্মক এবং তারপর বললেন :—

ধূমপানে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি আচ্ছন্ন হয় এবং অভ্যাসটি খারাপ। তোমরা যদি কোন ভাল চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা কর তবে শুনবে যে বহুক্ষেত্রে এই ধোঁয়া হচ্ছে কর্কট রোগের কারণ বা অন্তত এ রোগের মূলে আছে তামাকের ধোঁয়া।

যখন এর কোন প্রয়োজনীয়তা দেখা যাচ্ছে না, তখন ধূমপান করাই বা কেন? এ তো কোন খাদ্য নয়। সিগারেট ধরার সময় পরের শোনা কথায় যেটুকু আনন্দ পাওয়া গিয়েছিল, তা ছাড়া তো আর কোন আনন্দ নেই এতে।

তোমরা ছেলের দল যদি ভাল হও, তোমরা যদি তোমাদের শিক্ষকবর্গ ও অভিভাবকদের অনুগত হও, তাহলে ধূমপানের অভ্যাস বর্জন কর এবং এর দ্বারা যেটুকু অর্থ বাঁচাবে তা আমাকে লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর সহায়তার্থ পাঠিয়ে দাও।

সিংহলে গান্ধীজী পৃঃ ৭৫—৭৭

২৯। ছাত্রদের প্রতি উপদেশ *

শুদ্ধ চরিত্রের দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে এই মহান শিক্ষায়তনের তোমরা যা-কিছু শিক্ষা পাচ্ছ তা ব্যর্থ হবে।

তোমাদের পত্রিকাটি পড়ার সময় এখানকার কর্মকর্তাদের উদ্যম এবং অল্প কয়েকবছরে এখানকার যে প্রগতি হয়েছে তার প্রশংসা না করে থাকতে পারিনি।

* কলম্বোর জহিরা কলেজে ২৩-১১-১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত বক্তৃতা

কিন্তু ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে গভর্ণরের সামনে পঠিত বিবরণী পড়ার সময় আমার মনে এই চিন্তা এসেই গেল যে আমরা যদি সচ্চরিত্রতার ভিত্তি স্থাপন করে তাব উপর পাথরের পর পাথর বসিয়ে এক চারিত্রিক ইমারৎ গড়তাম, তাহলে গর্ব ও আনন্দ সহকারে আমরা আমাদের সৃষ্ট সৌধের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখতাম। শুধু কাদামাটি আর পাথর দিয়ে চরিত্র নির্মাণ হয় না। নিজের হাত ছাড়া আর কারও পক্ষে চবিত্র গঠন সম্ভব নয়। পুঁথিপত্রের পাতা থেকে অধ্যাপক-বর্গ বা অধ্যক্ষ মহোদয় তোমাদের চরিত্রবল দিতে অসমর্থ। চরিত্র-গঠন কর্মের প্রেরণা আসে তাঁদেব জীবন থেকে এবং সত্যিকথা বলতে কি এর অনুপ্রেরণা তোমাদেরই ভিতর থেকে আসা উচিত।

খ্রীষ্টান, হিন্দু এবং বিশ্বের অন্যান্য প্রমুখ ধর্মমত অধ্যয়ন করার কালে আমি দেখেছি যে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভেদ সত্ত্বেও এসবেব মাঝে এক মহান মৌলিক ঐক্য আছে এবং এ হচ্ছে সত্য ও নিষ্কলুষতা। তোমাদের 'নিষ্কলুষতা' কথাটির শব্দগত অর্থ নিতে হবে। এব অর্থ হচ্ছে জীবহত্যা না করা ও অহিংসা। আর তোমরা ছেলের দল যদি সত্য ও নিষ্কলুষতাব আদর্শেব প্রতি দৃঢ়সংলগ্ন হও, তাহলে বুঝতে পারবে যে তোমবা দৃঢমূল ভিত্তির উপর গডে উঠেছ।

তোমাদের সদাশয়তার প্রতীক এই টাকার তোড়ার জন্য তোমাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। ভারতেব বুভুক্ষু জনগণকে কর্মে নিয়োগ কবার জন্য এ অর্থ নিয়োজিত হবে। এব ভিতর হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান সকলেই পড়বে। তোমরা তাই আমার হাতে এই দান অর্পণ করে সেই বুভুক্ষু জনগণকে ও তোমাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত কবেছ এবং এ কাজ ঈশ্বরের কাছে প্রীতিপদ। তবে কোন্ কাজে এ অর্থ ব্যয়িত হবে তা যদি তোমরা না জান তবে এ সংযোগ-সূত্র হবে অতীব ক্ষীণ। এই অর্থ নিয়োগ করে আমার দেহে যে বস্ত্র রয়েছে ঐ জাতীয় বস্ত্র উৎপাদনের জন্য সহস্র সহস্র নরনারীকে নিযুক্ত করে তাদের কর্মের সংস্থান করা হবে। কিন্তু এসব টাকাই ব্যর্থ যাবে যদি না তোমরা এমন সব ব্যক্তি সৃষ্টি করতে পার যারা এই ভাবে উৎপন্ন খাদি পরিধান করবেন।

আজ আমরা খাদি দ্বারা সবরকমের রুচি ও ফ্যাশানের চাহিদা মেটাতে পারি। ভারতীয় জনগণের সঙ্গে চিরস্থায়ী সম্বন্ধ স্থাপনে ইচ্ছুক হলে অতঃপর তোমরা শুধু খাদিই পরিধান করবে।

সিংহলে গান্ধীজী পৃঃ ৮৮—৯০

৩০। মাহিন্দা কলেজে *

দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ভারতবর্ষের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি তাতে তোমাদের বলতে পারি যে কাদামাটি আর ইটকাঠই শিক্ষা সম্প্রসারণ নয়। খাঁটি ছেলেমেয়েরা নিয়ত প্রযত্নে সত্যকার শিক্ষা সৌধ রচনা করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নামে আখ্যাত স্থপতিকলার দিক থেকে নিখুঁত এমন অনেক হর্মের কথা আমি জানি, যা নিষ্প্রাণ সমাধিস্থল ছাড়া আর কিছু নয়। এরই ঠিক বিপরীত ব্যাপারও আমি দেখেছি। এমন অনেক প্রতিষ্ঠান আছে, প্রতিনিয়ত যাদের অর্থ-কষ্টের কারণে অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করতে হয়, অথচ প্রতিষ্ঠানগুলি এই অভাবের জন্যই প্রতিদিন আধ্যাত্মিক মার্গে অগ্রগতি করছে। মানবসমাজের একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক, যাকে তোমরা একমাত্র রাজাধিরাজ বলে অন্তরে আসন দিয়েছ, তিনি কোন মরমানব রচিত সৌধ হতে নিজ প্রাণবন্ত বাণী বিতরণ করেন নি। এক বিশাল মহীরুহের নীচে তাঁর মঞ্জু-কণ্ঠ গুঞ্জরিত হয়েছিল। অতএব সবিনয়ে আমি এই প্রস্তাব করেছি যে এই জাতীয় এক মহান প্রতিষ্ঠানেব শিক্ষা-ব্যবস্থা ও শিক্ষা-প্রণালী এমন হওয়া উচিত যাতে সিংহলের যে কোন ছেলেমেয়ে অবাধভাবে এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারে।

ভারতবর্ষ এবং এই দেশে আমি লক্ষ্য করেছি যে শিক্ষা-ব্যবস্থাকে প্রত্যহ তোমরা এমন ব্যয়বহুল করে তুলছ যে দরিদ্রতম ছাত্রটির পক্ষে বাণীদেবীর পীঠ-স্থানের নাগাল পাওয়া অসম্ভব হয়ে উঠছে। আমরা সকলে যেন এই গুরুতর ভ্রান্তি সম্বন্ধে সচেতন হই এবং ভবিষ্যদ্বংশীয়দের কাছ থেকে সঙ্গতভাবে যে ভর্ৎসনা পাওয়া উচিত, যেন তার হাত এড়াতে পারি। এই লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য আমি এখানকার ছেলেদের আগাগোড়া শিক্ষা সিংহলী ভাষার মাধ্যমে দেবার প্রতি জোর দেব। আমি এ বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় যে কোন জাতির ছেলেরা মাতৃভাষা ব্যতিরেকে অন্য ভাষায় শিক্ষা পেলে তারা আত্মহত্যা করছে বলতে হবে। এর ফলে তারা নিজ জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। বিদেশী মাধ্যমের অর্থ হচ্ছে শিশুদের উপর অন্যায় চাপ দেওয়া এবং এতে তাদের সমস্ত স্বকীয়তা কেড়ে নেওয়া হয়। এতে তাদের বুদ্ধি ব্যহত হয় এবং তারা গৃহ-পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। এই কারণে এই

---

* ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর গালার মাহিন্দা কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় প্রদত্ত বক্তৃতা।

জাতীয় ব্যাপারকে আমি বড় দরের জাতীয় দুর্গতি বলে মনে করি। এ ছাড়া আমার আর একটি প্রস্তাব আছে। সংস্কৃত সমস্ত ভারতীয় ভাষার মাতৃস্থানীয়া এবং তোমরা তোমাদের যাবতীয় ধর্ম শিক্ষা পেয়েছ এমন একজন ভারতীয়ের কাছ থেকে, যিনি ছিলেন ভারতের মুকুটমনি স্বরূপ ও সংস্কৃত ভাষা ছিল যাঁর সকল প্রেরণার উৎস। সুতরাং তোমাদের বিদ্যানিকেতনে সংস্কৃতকে পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত করা অতীব সমীচীন কার্য হবে এবং ছাত্ররা সানন্দে এই ভাষা শিখবে। আমি চাই যে এই জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান যেন সিংহলের সমগ্র বৌদ্ধ সমাজকে সিংহলী ভাষায় লিখিত গ্রন্থরাজী সরবরাহ করে এবং অতীতের জ্ঞানভাণ্ডার থেকে শ্রেষ্ঠ রত্নসমূহের পুনরুদ্ধার করে।

আমার মনে হয় না যে তোমরা একথা ভাববে যে তোমাদের সামনে আমি এক অসাধ্য আদর্শ পেশ করেছি। মাতৃভাষার মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও অতীতের বিস্মৃতপ্রায় জ্ঞানভাণ্ডারের পুনরুদ্ধারার্থ অমিত প্রচেষ্টা করার নিদর্শন ইতিহাসে যথেষ্ট আছে।

শরীর চর্চার প্রতি তোমরা যথোচিত মনযোগ দিয়েছ জেনে আমি খুশী হয়েছি এবং খেলাধূলায় সাফল্য অর্জন করেছ বলে তোমাদের অভিনন্দন জানাই। তোমাদের এখানে দেশী খেলা চলে কিনা আমার জানা নেই। আমি যদি একথা শুনি যে এই পবিত্রভূমিতে ক্রিকেট বা ফুটবলের আবির্ভাবের পূর্বে তোমাদের ছেলেমেয়েরা খেলাধুলার নামই জানত না, তাহলে আমি শুধু চরম বিস্মিত হব না, দুঃখিতও হব। তোমাদের যদি জাতীয় খেলাধূলা থাকে, তাহলে আমি বলব যে, তোমাদের প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য হচ্ছে জাতীয় ক্রীড়ার পুনরুদ্ধার ব্রতের পুরোধা হওয়া। আমি জানি ভারতে বহুবিধ সুন্দর স্বদেশী খেলা প্রচলিত আছে। এগুলি ক্রিকেট বা ফুটবলের মতই চিত্তাকর্ষক এবং উত্তেজনাকর। ফুটবলেরই মত ঝুঁকি নিয়ে এসব খেলায় যোগদান করতে হয়। অধিকন্তু দেশী খেলায় বাড়তি একটি সুবিধা আছে এবং তা হচ্ছে এই, এতে কোন খরচ নেই। এর খরচ প্রায় শূন্যের কোঠায় পড়ে।

'প্রাচীন' নামে আখ্যাত সবকিছুর বিচারবিহীন অন্ধ উপাসক আমি নই। যতই প্রাচীন হোক না কেন, অন্যায় বা দুর্নীতি মণ্ডিত সব কিছু ধ্বংস করার প্রচেষ্টায় আন্তরিকভাবে আত্মনিয়োগ করতে আমি কখনও ইতস্ততঃ করিনি। তবে তোমাদের কাছে আমি স্বীকার করছি যে প্রাচীন প্রথাগুলিকে আমি শ্রদ্ধা করি এবং লোকে সব কিছুকে আধুনিক করার প্রচণ্ড তাড়নায় তাদের প্রাচীন ঐতিহ্য বিসর্জন দেবে এবং নিজ জীবনে তাদের অস্বীকার করবে, এ ভাবতেও আমি ব্যথা পাই।

প্রতীচির আমরা সময় সময় হঠকারিতা বশতঃ এই মনে করি যে আমাদের পূর্বজগণ যা কিছু বলে গেছেন, তা সব এক কুসংস্কারের স্তূপ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাচ্যের অমূল্য রত্নরাজির অনুসন্ধান কার্যে আমি বহুদিন আত্মনিয়োগ করার ফলে আমার এই অভিজ্ঞতা জন্মেছে যে আমাদের মধ্যে অনেক কুসংস্কার থাকলেও তার চেয়েও বেশী এমন অনেক জিনিস আছে যা কিনা কদাচ কুসংস্কার পদবাচ্য নয়। বরং এসব জিনিস ঠিকমত বুঝে তদনুযায়ী আচরণ করলে আমাদের ভিতর প্রাণ সঞ্চার হবে এবং আমরা মহীয়ান হয়ে উঠব। আমরা যেন তাই পশ্চিমের সম্মোহন-কারী চটকে অন্ধ না হই।

পশ্চিমাগত সবকিছুর আমি নির্বিচারে বিরোধী—তোমাদের এই বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আমি আবার সতর্ক বাণী উচ্চারণ করব। পাশ্চাত্যের এমন অনেক জিনিস আছে যা আমি নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছি। বাঞ্ছনীয় এবং অবাঞ্ছনীয় ও সত্য এবং মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করার জন্য মানুষের মধ্যে যে গুণটি বিদ্যমান, সংস্কৃত ভাষায় তার মহান ও কার্যকরী নাম হচ্ছে 'বিবেক'। আমি আশা করি যে পালি এবং সিংহলী ভাষায় তোমরা এ শব্দটিকে গ্রহণ করবে।

তোমাদের পাঠ্যক্রম সম্বন্ধে আমি আর একটি কথা বলব। আমি আশা করে-ছিলাম যে এতে আমি কোন হস্তকর্ম সন্নিবিষ্ট দেখব এবং বাস্তবিক তোমরা যদি তোমাদের অধীনস্থ ছেলেদের কোন হস্তকর্ম না শেখাচ্ছ তাহলে আমার অনুরোধ হচ্ছে এই যে অনতিবিলম্বে এই দ্বীপে প্রচলিত কোন কুটীর শিল্প তোমরা শেখানো সুরু কর। এই প্রতিষ্ঠান থেকে যে সব ছেলে বেরোবে তারা সকলে নিশ্চয় কেরানী বা সরকারী কর্মচারী হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করবে না। জাতির শক্তিবৃদ্ধিকামী হলে সুনিপুণভাবে তাদের দেশীয় শিল্পকলা শিখতে হবে এবং সুতা কাটার চেয়ে মহত্তর এমন কোন শিল্পের কথা আমি জানি না যা সাংস্কৃতিক শিক্ষনের এত সুন্দর মাধ্যম এবং যা দীনতম ব্যক্তিটির সঙ্গে একাত্ম করার এত সুন্দর প্রতীক। প্রক্রিয়া সরল ও অতি সহজে শেখা যায়। সুতা কাটার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের মনে যখন এই ভাব জাগবে যে নিজের জন্য নয়, এ শিক্ষা জাতির দরিদ্রতম ব্যক্তিটির জন্য, তখন এ এক মহান যজ্ঞের রূপ পরিগ্রহ করবে। এই যজ্ঞের সঙ্গে এমন একটি বৃত্তি ও হস্তকর্মের সমন্বয় সাধন করতে হবে, যার সাহায্যে ছেলেটি উত্তরকালে নিজ জীবিকা উপার্জনে সক্ষম হবে বলে মনে করবে।

ধর্মশিক্ষাকে তোমরা যথাযোগ্য মর্যাদা দিয়েছ। ধর্মশিক্ষা দেবার শ্রেষ্ঠ পন্থা জানার জন্য অনেকগুলি বালককে নিয়ে আমি পরীক্ষা করেছি। আমি দেখেছি যে বই এ বিষয়ে কিছুটা সাহায্য করলেও তার কোন স্বকীয় মূল্য নেই। আমি লক্ষ্য

করেছি যে অতীতে এমন সব ধর্মগুরু ধর্মশিক্ষা দিতেন, যাঁরা ধর্মমত সমস্ত জীবন-যাপন করতেন। আমি দেখেছি যে শিক্ষকগণ ছাত্রদের কাছে যে বই পড়েন বা তাদের কাছে যে মৌখিক বক্তৃতা দেন, তার চেয়ে তাঁদের জীবনযাত্রা প্রণালী থেকে ছাত্ররা অনেক বেশী শেখে। ছেলেমেয়েদের ভিতর সকলের অজ্ঞাতসারে অপরের মনে অনুপ্রবেশ করার গুণ আছে এবং এর দ্বারা তারা শিক্ষকদের মনোভাব অধ্যয়নে সমর্থ হয়, একথা আবিষ্কার করে আমি উল্লসিত হয়েছি। যে শিক্ষক মনে এক রকম কথা রেখে মুখে আর এক কথা শেখান, তাঁর জন্য দুঃখ করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

তোমাদের ভাগ্য তোমাদেরই হাতে। দুটি সর্ত তোমরা যদি পালন কর, তবে স্কুলে তোমবা কি শেখ না শেখ তার জন্য আমি বিন্দুমাত্র চিন্তিত নই। প্রথম সর্ত হচ্ছে এই যে সম্ভাব্য যে কোন পরিস্থিতিতে যে কোন রকম বিপদ দেখা দিক না কেন, নির্ভয়ে তোমবা সত্যকে আঁকড়ে ধরে থাকবে। সত্যবাদী ও সাহসী বালক কদাচ একটি মক্ষিকাকেও আঘাত করার কথা মনে স্থান দেবে না। নিজ বিদ্যালয়ের প্রতিটি দুর্বল বালককে সে রক্ষা করবে এবং বিদ্যালয়েব ভিতরে বা বাইরে সর্বত্রই সে প্রতিটি সাহায্যকামী বালককে সহায়তা দেবে। যে ছেলে কায়িক, মানসিক ও বাচনিক প্রবিত্রতা পালন না কবে, সে যে কোন শিক্ষায়তন থেকে বিতাড়িত হবার উপযুক্ত। সৌজন্য গুণান্বিত যে কোন বালক সর্বদা মনকে পবিত্র রাখবে, তার দৃষ্টি সরলরেখার মত হবে এবং তার হস্তদ্বয় হবে নিষ্কলুষ। জীবনের এই মৌলিকব্রত শিক্ষার্থ কোন বিদ্যালয়ে যাবাব প্রয়োজন নেই। তোমাদের চরিত্রে এই ত্রিবিধ-গুণের সমাবেশ হলে তোমাদের ভিত্তি দৃঢ়মূল বলে মনে করা যেতে পারে।

তাই সারা জীবন যেন সত্যকার অহিংসা ও পবিত্রতা তোমাদের বর্ম হয়। ঈশ্বর যেন তোমাদের সকল মহান আদর্শ পূরণে সহায়ক হন।

সিংহলে গান্ধীজী পৃঃ ১০৫—১০৯

৩১। দান ব্রতের লক্ষ্য *

লক্ষপতিদের কাছ থেকে যদিও আমি দান পাই এবং যদিও সকৃতজ্ঞচিত্তে আমি সে দান গ্রহণ করি, তবু যেসব ছেলেমেয়ের দল এখনও তাদের জীবন গড়ার কাজে মগ্ন, তাদের কাছ থেকে যতই অল্প হোক না কেন, স্বল্প পরিমাণ দান পাওয়া আরও বেশী আনন্দের কথা। দুটি কারণে আমি এতে অধিকতর প্রসন্ন হই। প্রথমতঃ

* জাফনার সেণ্ট জনস কলেজে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে নভেম্বর প্রদত্ত বক্তৃতা।

অপাপবিদ্ধ বালক-বালিকার কাছ থেকে যে দান আসে তা তথাকথিত ইহজাগতিক ব্যাপারে জ্ঞানী ব্যক্তিদের দানের চেয়ে অধিকতর ফলপ্রসূ। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এই যে তোমাদের এই উপহারের মত দান আমার মনে এমন এক গভীরতর কর্তব্য বোধ জাগায়, যা হয়ত অন্য উপায়ে সম্ভব হোত না।

তোমরা জান যে এই থলির প্রত্যেকটি টাকায় ভারতের দূরতম গ্রামের বাসিন্দা ষোলজন বুভুক্ষু রমণী কাজ পাবে এবং তাদের কাজের বিনিময়ে দৈনিক এক আনার সংস্থান করে দেবে। স্মরণ রেখো যে তারা এবং তাদের সন্তান-সন্ততি দুবেলা ভর-পেট খাওয়া বলতে যা বুঝায় তা পায় না এবং একথা আমি বলছি আমার ভারতের শত শত গ্রামের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। তাই তোমাদের উপহারকে সত্যকার দানের এক আদর্শ বলা যায়। যৌবনকালে যখন তোমাদের কোন দায়িত্ব বহন করতে হচ্ছে না, তখন থেকেই তোমরা শুধু নিজের জন্য নয়, তোমাদের চেয়েও অনেক গরীব এবং দুর্ভাগাদের জন্য ভাবছ। এতদাপেক্ষা শ্রেয়স্কর ও মহত্তর আর কি হতে পারে?

তোমাদের বিদ্যালয়ে যে কোন ভেদাভেদ নেই এবং কাউকে যে অস্পৃশ্য বিবেচনা করা হয় না, নিঃসন্দেহেই এ একটা বিরাট ব্যাপার। এই মহত্ত্ব নিসিক্ত টাকার তোড়া আমাকে অর্পণ করে তোমরা আসলে তোমাদের দ্বারা অনুসৃত আদর্শেরই পরিপূর্তি করেছ। কারণ এই যে সব শিশু ও নারীর প্রতিভূস্বরূপ আমাকে এই তোড়া দেওয়া হয়েছে, তারা তথাকথিত অস্পৃশ্যদের চেয়েও হতভাগ্য। তোমাদের দয়া ও মহত্ত্বের প্রতিদান দেবার সাধ্য আমার নেই। আমি শুধু ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করতে পারি যে তোমাদের জীবনের সকল সৎকার্যের জন্য তিনি যেন তোমাদের আশীর্বাদ করেন। কারণ আমি জানি যে হৃদয়ের সত্যিকার শিক্ষা বিনা শুধু বৌদ্ধিক শিক্ষার কোন মূল্য নেই। তোমাদের মনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ও যেন বিকশিত হয়ে ওঠে।

সিংহলে গান্ধীজী পৃঃ১৪১—৪২

৩২। যীশুর স্থান *

এক কথায় বলতে গেলে বহু বহু বৎসর যাবৎ যীশুকে আমি বিশ্বের অন্যতম ধর্মগুরুর মর্যাদা দিয়ে আসছি এবং একথা আমি উচ্চারণ করছি যথোচিত দীনতা সহকারে। এই কথাটি বলতে দৈন্যের উল্লেখ করার সহজ কারণ হচ্ছে এই যে

* জাফনার সেন্ট্রাল কলেজে ২৯-১১-২৭ তারিখে প্রদত্ত বক্তৃতা।

আমার মনে ঠিক এই ভাবই জাগে। অখ্রীষ্টান বা হিন্দু হিসাবে আমি যীশুকে যা মনে করি, খ্রীষ্টানরা অবশ্য যীশুর জন্য তার চেয়ে অনেক উচ্চ মর্যাদা দাবী করেন। "মর্যাদা দিই" কথাটির বদলে ইচ্ছে করেই আমি "মনে করা" ব্যবহার করেছি। কারণ আমার মতে আমার নিজের বা অন্য কারও কোন মহাপুরুষকে মর্যাদা দান করার মত স্পর্দ্ধা প্রকাশ করা অনুচিত। বিশ্বের কোন মনীষীকে মর্যাদা দিতে হয় না, স্বতঃসিদ্ধ অধিকার বলে তাঁরা এ সম্মান পেয়ে থাকেন। তাঁরা যে সেবা দেন, তার বিনিময়েই তাঁরা এ স্থান পান। কিন্তু আমাদের মত দীনহীন ব্যক্তিদের মর্যাদা দেওয়া হয় যাতে ব্যক্তিবিশেষ সম্বন্ধে আমাদের মনে বিশেষ একটা মনোভাব জাগে। কোন মহান ধর্মগুরু এবং আমাদেব মধ্যে সম্পর্কটা হচ্ছে কতকটা স্বামী-স্ত্রীব মত। আমাব স্ত্রীর স্থান আমাব হৃদয়ের কোন স্থানটিতে, তা যদি আমাকে বুদ্ধিগ্রাহ্য যুক্তিতর্ক দিয়ে প্রমাণ করতে হয় তাহলে তাকে এক চরম বিপত্তিকর এবং শোকাবহ ব্যাপাব বলতে হবে। কথাটা আমার 'স্থান' দেওয়া নয়। স্বাধিকার বলেই তিনি আমার হৃদয়ে তাঁব নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করেন। এ হচ্ছে স্রেফ অনুভূতির ব্যাপার। সুতবাং আমি একথা বলতে পারি যে যীশু আমার হৃদযে বিশ্বের অন্যতম মহান ধর্মনায়করূপে অধিষ্ঠিত ও আমার জীবনকে তিনি প্রভুত্বরূপে প্রভাবিত করেছেন। এখনকার মত খ্রীষ্টানদের কথা বাদ দেওয়া যাক। এই কলেজের বিদ্যার্থী-দের মধ্যে শতকরা পঁচাত্তর জন হিন্দু। তাদেব আমি বলব যে যীশুর বাণী শ্রদ্ধা সহকারে অধ্যয়ন না করলে তাদের জীবন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, যে কোন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিই হোক না কেন, সে যদি ভক্তিভরে অন্যধর্মের উপদেশাবলী পাঠ করে, তাহলে তার হৃদয় সংকীর্ণ হবার বদলে উদার হয়। ব্যক্তিগতভাবে আমি পৃথিবীর কোন বিখ্যাত ধর্মমতকে মিথ্যা বলে মনে করি না। এর প্রত্যেকটিই মানব সমাজকে সমৃদ্ধ করার জন্য কাজ করেছে এবং এখনও একাজ করে চলেছে। আগেই আমি বলেছি যে উদার শিক্ষা বলতে আমি বুঝি তার সঙ্গে অন্য ধর্মমতের শ্রদ্ধাযুক্ত চর্চার ব্যবস্থা সন্নিবিষ্ট করা। কিন্তু এ নিয়ে আব আমি আলোচনা করতে চাই না, আর তার সময়ও নেই।

প্রথম জীবনে বাইবেল পাঠকালে আমার মনে যে কথাটি জেগেছিল, তার কথা বলব। "এই বিশ্বকে দেবলোক ও তাঁর ন্যায় রাজ্যে পরিণত কর। এই হলেই আর সব আপনি হবে"—এই অনুচ্ছেদটি পাঠমাত্র আমি চমকিত হলাম। আমি বলছি যে তোমরা যদি এই অনুচ্ছেদের অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর ও একে প্রশংসনীয় আদর্শ বিবেচনা করে যদি এই নীতি অনুযায়ী চল; তাহলে যীশু বা অন্য কোন ধর্মগুরুর

আসন তোমাদের হৃদয়ের কোন্‌খানে, সেকথা জানারই আর প্রয়োজন ঘটবে না। দক্ষ ঝাড়ুদারের মত যদি তোমরা নিজ অন্তঃকরণকে পরিষ্কার করে শুদ্ধকরতঃ প্রস্তুত হও, তাহলে দেখবে যে এইসব মহান ধর্মগুরু আমাদের আমন্ত্রণ বিনাই স্বস্থানে অধিষ্ঠিত হবেন। আমার মতে সকল দৃঢ়মূল শিক্ষার এই হচ্ছে বনিয়াদ। মনের অনুশীলনের স্থান হৃদয়ের নীচে। ভগবান যেন তোমাদের পবিত্র হতে সহায়তা দেন।

সিংহলে গান্ধীজী পৃঃ ১৪৩—৪৪

৩৩। উদিভিল গার্ল'স কলেজ *

তোমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত হয়েছে তোমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মুষ্টিভরা দান। এ দান সর্বসাধারণের টাকার তোড়ায় মিশে গিয়ে স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলুক এ আমি চাই না। তবে তোমাদেব উপহার সর্বসাধারণের দানের সঙ্গে মিশে গেছে বলে সমস্ত অর্থেরই আমি যথাসম্ভব আদর্শ উপযোগ করব। তোমরা ছেলেদের চেয়েও বিনয়ী বলে বোধ হয় জানতেই দিতে চাও না যে তোমরা আমাকে কিছু দিয়েছ। কিন্তু ভারতবর্ষে সহস্র সহস্র মেয়ের সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ পেয়েছি বলে আজকাল মেয়েদের পক্ষে তাদের যে কোন সৎকাজের কথা আমার কাছ থেকে লুকানো কঠিন।

আবার এমন অনেক মেয়ে আছে, যারা আমার কাছে তাদের দুষ্কৃতির কথাও প্রকাশ করে। আমি আশা করি আমার সামনে যেসব মেয়ে রয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কোন কুকার্য করে না। জেরা কবার সময় নেই বলে তোমাদের প্রশ্ন করে ব্যতিব্যস্ত করব না। তবে আমাদের ভিতর যদি এমন কোন মেয়ে থাকে যে অপকার্য করে, তাহলে আমি বলব যে সেক্ষেত্রে তার শিক্ষাই ব্যর্থ। তোমাদের অভিভাবকরা তোমাদের পুতুল গড়ে তুলতে স্কুলে পাঠান না। তোমাদের বরং "সিস্টারস অফ মার্সি" হতে হবে। একথা যেন ভুলেও ভেব না যে যারা কোন বিশেষ ধরণের পোশাক পরে তাদেরই শুধু "সিস্টারস অফ মার্সি" বলা হয়। যে মুহূর্তে সে নিজের সম্বন্ধে কম ভেবে, তার চেয়েও গরীব ও দুর্ভাগাদের জন্য বেশী করে ভাবে, সেই মুহূর্তেই সে "সিস্টারস অফ মার্সি" হয়ে যায়। আর আমাকে যে টাকার তোড়া দেওয়া হয়েছে, তাতে যথাসাধ্য দান করে তোমরা "সিস্টারস অফ মার্সি" হয়ে গেছ; কারণ এ টাকা এমন লোকদের জন্য দেওয়া হয়েছে, যারা দুর্ভাগ্যবশতঃ

* ২৯-১১-১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের বক্তৃতা।

তোমাদের চেয়েও গরীব।

সামান্য দু'চার টাকা দিয়ে দেওয়া সহজ, কিন্তু ছোট্ট একটুখানি কাজ করা কঠিন। যাদের জন্য তোমরা আমাকে টাকা দিলে, তাদের প্রতি তোমাদের যদি সত্যকার সহানুভূতি থেকে থাকে, তাহলে তোমাদের আর এক পা এগিয়ে তাদের দ্বারা উৎপন্ন খাদি পরিধান করতে হবে। তোমাদের সামনে খাদি আনলে তোমরা যদি বল, "খাদি একটু মোটা, আমরা এ পরতে পারব না"—তাহলে বুঝব যে তোমাদের ভিতর স্বার্থত্যাগ বৃত্তি নেই।

খাদি এমন সুন্দর জিনিস যে এতে উচ্চনীচ, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের ভেদাভেদ নেই। আর তোমাদের হৃদয়ের টান যদি ঐদিকে থাকে ও তোমরা যদি এই অহমিকা দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে না ভাব যে তোমরা অন্য মেয়েদেব চেয়ে উঁচুদরেরর, তাহলে খুব ভাল হয়।

ঈশ্বরের করুণা ধাবা তোমাদের শিবোপরি বর্ষিত হোক।

সিংহলে গান্ধীজী পৃঃ ১৪৪—৪৬

৩৪। রামনাথন্ গার্ল'স কলেজে

আজকের সকালের এই অনুষ্ঠান যে নিরুপম সুরুচি এবং অনাড়ম্বরতা মণ্ডিত হয়েছে, তা আমার দৃষ্টি এড়ায়নি। এ বিষয়ে তোমবা নিশ্চিন্ত হতে পার। তোমাদের অকৃপণ হস্তের দানেব প্রতীক এই ১১১১৲ টাকার জন্য তোমাদের প্রশংসা জানাই। এই টাকাটাও তোমরা আবাব খাদির থলিতে করে দিয়েছ, যা অন্যত্র বিশেষ কোথাও দেখা যায়নি। সর্বোপরি স্যাব পি. রামনাথন্ স্বয়ং এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত না থাকতে পারায় যে তাববার্তাটি পাঠিয়েছেন, লেডি বামনাথন্ তা আমার হাতে দিয়েছেন।

স্যার রামনাথনের মহানুভবতা এবং মননশীলতার প্রতীক এই প্রতিষ্ঠানটি দেখতে না পেলে আমার মনে চিরকালেই খেদ থেকে যেত। তোমাদের অভিনন্দন পত্রের একটি নকল এবং এই প্রতিষ্ঠানের কার্য-বিবরণী ও তোমাদের পত্রিকার দুটি সংখ্যা আমাকে অগ্রিম দিয়ে লেডি রামনাথন্ অতীব সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন।

আজকের দিনটিকে তোমরা নিয়মিত বাৎসরিক অনুষ্ঠানরূপে পালন করবে এবং খাদি কার্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ মানসে এদিন চেষ্টা করবে—তোমাদের এই সংকল্প আমার হৃদয়ের নিভৃততম কন্দরে অনুরণণ সৃষ্টি করেছে। আমি জানি

তোমরা লঘুভাবে এ শপথ গ্রহণ করনি, ধর্মীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তোমরা এ সংকল্প পূর্ণ করবে। যে দৈন্যপীড়িত জনগণের প্রতিভূরূপে আমি সফর করে বেড়াচ্ছি, তারা যদি তাদের ভগ্নীদের এই সংকল্পের কথা হৃদয়ঙ্গম করতে পারত, তবে আমি জানি যে এতে তাদের বুক ফুলে উঠত। তোমরা কিন্তু আমার কাছে একথা শুনে দুঃখিত হবে যে, যাদের জন্য তোমরা এবং তোমাদের মত আরও অনেকে সিংহলে আমাকে এই টাকার তোড়া দিল, তারা, আমি বোঝাতে চেষ্টা করলেও, এর বিন্দুবিসর্গ বুঝবে না। তাদের শোচনীয় জীবন সম্বন্ধে আমি যত বর্ণনাই করি না কেন, তোমরা হয়ত কিছুতেই সে অবস্থার স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবে না।

এ থেকে স্বতঃই এই প্রশ্নটি জাগে—এই সব এবং এই জাতীয় লোকদের জন্য তোমাদেব কি কবা উচিত ? আব একটু অনাড়ম্বব হওয়া বা জীবনে আর একটু কৃচ্ছ্রতা আনয়ন কবা ইত্যাদি উপদেশ দেওযা সহজ। কিন্তু তাতে প্রশ্নটির মূল স্পর্শ করা হবে না। এ সম্বন্ধে ভেবে ভেবে আমি চবকাব কথায় উপনীত হয়েছি। তোমাদের আজ যে কথা বলছি সেই কথাই নিজেব মনে মনে আমি বললাম—এই বুভুক্ষু জনসাধাবণেব সঙ্গে কোন জীবন্ত যোগসূত্র স্থাপন কবতে পাবলে তোমাদের, তাদের এবং সারা জগতেব পক্ষে একটা আশাস্থল দেখা যাবে।

তোমাদেব এ প্রতিষ্ঠানে ধর্মশিক্ষাব ব্যবস্থা আছে এবং থাকা উচিত। এখানে একটি মনোবম দেব-দেউলও আছে। তোমাদেব দৈনন্দিন কর্মসূচীতে দেখছি যে তোমাদের দিনেব কাজ সুরু হয় প্রার্থনা দিয়ে। এ সবই ভাল এবং আশাব্যঞ্জক। কিন্তু সে প্রার্থনা যদি কোন নিত্য-নৈমিত্তিক বাস্তব কর্মে প্রকট না হয়, তবে এব শুধু এক প্রাণহীন অনুষ্ঠানে পর্যবসিত হবার আশঙ্কা আছে। প্রার্থনার এই ধারা অনুসরণ করার জন্যই আমি বলি যে চবকা ধব, আধঘণ্টা সুতা কাট এবং যেসব জনগণেব কথা আমি তোমাদেব বলেছি তাদেব কথা ভাব। এরপব মনে ঈশ্বর স্মরণ করে বল, "আমি এই জনগণের জন্য সুতা কাটছি।" হৃদয় মন দিয়ে তোমরা যদি একাজ কর, তোমাদেব মনে যদি এই ভাবনা থাকে যে, সেই খাঁটি উপাসনা কার্যের তোমরা আদর্শ, দীন এবং সম্পন্ন পাত্র, তোমাদের পরিচ্ছদ পরিধানের কারণ যদি সাজগোজ করা না হয়ে দেহাচ্ছাদন হয়, তাহলে খাদি পবতে এবং নিজেদের সঙ্গে জনগণের সেই যোগসূত্র স্থাপন করতে তোমাদের মনে কোনরকম ইতঃস্তত ভাব আসার কথা নয়।

এই প্রতিষ্ঠানের মেয়েদের কাছে আমার বক্তব্য কিন্তু এখানেই শেষ হল না। স্যার রামনাথন্ তোমাদের প্রতি যে যত্ন ও দৃষ্টি দিয়েছেন এবং লেডি রামনাথন্

ও তাঁর পরিচালনাধীনে যেসব কর্মচারী তোমাদের সুযোগ-সুবিধার প্রতি নজর রাখছেন, তোমরা যদি তার যোগ্য হতে চাও, তাহলে তোমাদের আরও অনেক কিছু করতে হবে। তোমাদের পত্রিকায় দেখলাম ঈষৎ গর্ব সহকারে কয়েকজন প্রাক্তন ছাত্রীর কার্যকলাপের উল্লেখ আছে। অমুকে অমুককে বিবাহ করেছে— এই মর্মে চার-পাঁচটি বিজ্ঞপ্তিও দেখলাম। পঁচিশ বা এমন কি বাইশ বছরের মেয়েদের বিবাহ করার মধ্যে কোন অন্যায় নেই। কিন্তু এইসব বিজ্ঞপ্তিতে আমার এমন একটি নামও চোখে পড়ল না যে জনসেবার কাজে আত্মোৎসর্গ করেছে। সুতরাং বাঙ্গালোরের মহারাজ কলেজের মেয়েদের আমি যা বলেছিলাম, তার পুনরুক্তি করে বলব যে এইসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্রব ছাড়লেই তোমরা যদি স্রেফ পুতুলটি হয়ে জীবনের রঙ্গমঞ্চ থেকে অদৃশ্য হও, তাহলে বলতে হবে যে শিক্ষাবিদ্‌রা যে প্রচণ্ড পরিশ্রম করছেন এবং দানবীরেরা দানের যে ধারা বইয়ে দিচ্ছেন, তার বিনিময়ে কোন উল্লেখযোগ্য প্রতিদান মিলছে না।

স্কুল-কলেজ থেকে ছাড়া পাওয়া মাত্র অধিকাংশ মেয়ে প্রকাশ্য জনসেবামূলক জীবন থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীর দল, তোমাদের এমন করলে চলবে না। তোমাদের সামনে কুমারী এমারীর উদাহরণ রয়েছে এবং এছাড়া আমার মনে হয় এখনকার কর্মচারীদের মধ্যে আরও অনেক অবিবাহিতা মহিলাও রয়েছেন।

প্রত্যেক মেয়ে, প্রতিটি ভারতীয় মেয়েকে যে বিয়ে করতেই হবে এমন কথা নয়। এমন অনেক মেয়ে আমি দেখাতে পারি যারা একজন মাত্র লোকের সেবা না করে নিজেদের সকলের সেবার জন্য উৎসর্গ করেছে। হিন্দু মেয়েদের সীতা বা পার্বতীর নবীন এমন কি অধিকতর গৌরবমণ্ডিত সংস্করণ সৃষ্টি করার দিন এসে গেছে।

তোমরা নিজেদের শৈব বল। পার্বতী যে কি করেছিলেন, তা তোমরা জান? স্বামীলাভের জন্য তিনি অর্থব্যয় করেন নি বা নিজেকে তিনি বিক্রয়োপযোগী পণ্যে পরিণত হতে দেন নি। আজ কিন্তু তিনি সপ্ত-সতীর অন্যতমরূপে পরিগণিত হয়ে হিন্দু-কুল-চূড়ামণি রূপে শোভিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন ডিগ্রীর জোরে নয়, এ গৌরব তিনি পেয়েছিলেন তাঁর অশ্রুতপূর্ব তপস্যার বলে।

আমার মনে হয় এখানে সেই ঘৃণ্য পণপ্রথা বিদ্যমান এবং এর জন্য তরুণীদের উপযুক্ত জীবনসঙ্গী পাওয়া অতীব দুষ্কর হয়ে পড়ে। তোমাদের মধ্যে অনেকে বয়ঃ-প্রাপ্ত হয়েছে। তাদের কর্তব্য হচ্ছে এই জাতীয় প্রলোভনের প্রতিরোধ করা। এই কু-প্রথার প্রতিরোধ করতে গেলে তোমাদের মধ্যে অনেককে আজীবন এবং

অনেককে বেশ কয়েক বৎসর কুমারী থেকে যেতে হবে। তারপর যখন তোমাদের বিবাহকাল সমাগত হবে এবং তোমরা যখন মনে করবে যে এবার একজন জীবনসঙ্গী প্রয়োজন, তখন তোমরা এমন কাউকে খুঁজো না, যার ধন, যশ বা দেহসৌষ্ঠব আছে। পার্বতীর মতই তোমরা এমন লোকের সন্ধান করবে, যার মধ্যে সৎচরিত্র গঠনের উপযোগী গুণাবলী বিদ্যমান। নারদ যে পার্বতীর কাছে মহাদেবের কিরকম বর্ণনা দিয়েছিলেন, তা তোমরা জান—"গায়ে ছাইমাখা ভিখারী, রূপের কোন বালাই নেই, তায় আবাব ব্রহ্মচারী।" পার্বতী এর জবাবে বললেন, "হ্যাঁ, তিনিই আমার পতি।" তোমাদের ভিতর কেউ কেউ তপস্যা করতে মনস্থ না করলে একাধিক শিবের সৃষ্টি হবে না। অবশ্য পার্বতীর মত তোমাদেব সহস্র বৎসর তপস্যা করতে হবে না। আমাদের মত ক্ষীণজীবি মানব অতটা পারব না, তবে তোমাদেব জীবদ্দশায় তোমরা এই তপস্যা চালিয়ে যেতে পাব।

পূর্বোক্ত সর্তগুলি স্বীকাব কবলে তোমরা পুতুলের দেশে নিরুদ্দেশ হতে অস্বীকার কববে। তোমবা তখন পার্বতী, দময়ন্তী, সীতা এবং সাবিত্রীর মত সতী হতে চাইবে। আমার মত ক্ষুদ্রব্যক্তিব অভিমতে তখনই তোমাদের এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানেব আওতায় আসার অধিকার জন্মাবে।

ভগবান যেন তোমাদেব এই আশায় উদ্দীপ্ত করে তোলেন এবং তোমাদের মধ্যে প্রেরণা জাগলে তিনি যেন সে আশার পরিপূর্তিব জন্য তোমাদের সহায়তা করেন।

সিংহলে গান্ধীজী পৃঃ ১৪৬—৪৯

৩৫। ছত্রদের মহান সত্যাগ্রহ

এই পত্রিকায় সত্যাগ্রহের বিশ্বজনীনতা সম্বন্ধে আলোচনাকালে একাধিকবার আমি বলেছি যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রের মত সামাজিক ক্ষেত্রেও এ সমভাবে প্রযোজ্য। সরকার, সমাজ বা নিজ পরিবারের পিতা, মাতা, স্বামী বা স্ত্রী—ক্ষেত্রানুসারে সকলের উপরই এর প্রয়োগ চলতে পারে। কারণ এই আধ্যাত্মিক আয়ুধটির গুণই হচ্ছে এই যে হিংসা স্পর্শরহিত হয়ে শুধুমাত্র প্রেমভাব দ্বারা পরিচালিত হলে একেবারে একে যত্রতত্র এবং যে কোন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করা যায়। খেদা জেলার ধার্মাজের সাহসী ও তেজস্বী ছাত্রের দল কয়েকদিন আগে এর একটি জলন্ত উদাহরণ পেশ করেছে। বিভিন্ন বিবরণী থেকে এ ঘটনা সম্বন্ধে আমি নিম্নরূপ তথ্য পেয়েছি।

ধার্মাজের জনৈক ভদ্রলোক মাতার মৃত্যুর দ্বাদশদিনে স্বজাতীয়দের একটি ভোজ

দেন। এই প্রথার তীব্র বিরোধী সেখানকার যুব সম্প্রদায় ও স্থানীয় কয়েকজন অধিবাসী পূর্বাহ্ণে এ নিয়ে তীব্র বাদানুবাদ করেন। তাঁরা মনে স্থির করলেন যে এই সময়ে কিছু করা উচিত। এতদানুযায়ী তাদের মধ্যে অধিকাংশই নিম্নলিখিত তিনটি সংকল্পের ভিতর কয়েকটি বা সবগুলি গ্রহণ করলেন :—

১। তাঁদের গুরুজনদের সঙ্গে তাঁরা সেই ভোজ খেতে যাবেন না বা কোন-রকমে তার সঙ্গে সহযোগিতা করবেন না।

২। এই প্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিবাদ জ্ঞাপনার্থ সেদিন তাঁরা উপবাস করবেন।

৩। এই পন্থানুসরণ করার জন্য গুরুজনরা যে কোন রূঢ় আচরণ করুন, তা তাঁরা সানন্দে বরণ করবেন।

এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কয়েকটি নাবালকসহ বহু ছাত্র ভোজের দিন উপবাস করল এবং এই অবাধ্যতার জন্য তাদের তথাকথিত গুরুজনদের রোষবহ্নির দহন বরণ করে নিল। এর ফলে ছাত্রদের গুরুতর আর্থিক ক্ষতিরও আশঙ্কা ছিল। 'গুরুজনরা' নিজ নিজ সন্তানের খরচ বন্ধ করে দেবার হুমকি দিলেন এবং স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সাহায্য দিচ্ছিলেন, তাও বন্ধ করে দেবার শাসানী দিলেন। ছাত্ররা কিন্তু অটল রইল। দুইশত পঁচাশিজন ছাত্র এইভাবে জাতের ভোজে অংশ গ্রহণ করেনি এবং তাদের মধ্যে অধিকাংশ সেদিন উপবাসী রয়ে গেল।

এইসব ছেলেদের আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আশা করছি যে সমাজ সংস্কারের ব্যাপারে প্রত্যেক জায়গায় ছাত্ররা এইভাবে প্রমুখ অংশ গ্রহণ করবে। তাদের কাছে যেমন স্বরাজের চাবিকাঠি রয়েছে, তেমনি তাদের পকেটে রয়েছে সমাজ সংস্কার ও ধর্মরক্ষার চাবি। নিজেদের অবহেলা ও উদাসীনতার জন্য তারা বোধহয় এর খবর রাখে না। তবে আমি আশা করি যে ধার্মাজের ছাত্রদের উদাহরণ নিজশক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করবে। আমার মতে পরলোকগতা মহিলাটির সত্যকার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করেছিল ঐ উপবাসী ছেলেগুলি। আর যাঁরা ভোজ খাওয়ালেন, তাঁরা অর্থের অপচয় করার সঙ্গে সঙ্গে দরিদ্রদের সামনে কুদৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। ধনী ও বিত্তশালী সম্প্রদায়ের কর্তব্য হচ্ছে ঈশ্বরদত্ত অর্থকে মানব হিতৈষণায় নিয়োগ করা। তাঁদের বোঝা উচিত যে দরিদ্রদের পক্ষে বিবাহ বা শ্রাদ্ধ উপলক্ষে স্বজাতীয়দের ভোজন করানো অসম্ভব। এই কুপ্রথা বহু দরিদ্রের ধ্বংসের কারণ হয়েছে। ভোজের জন্য ধার্মাজে যে অর্থ ব্যয় হল, তা যদি দরিদ্র ছাত্র বা গরীব বিধবাদের সাহায্যের জন্য অথবা খাদি, গোরক্ষা কিংবা হরিজনদের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হত, তাহলে এর সদুপযোগ হত এবং মৃতাত্মাও শান্তি পেতেন। কিন্তু

ব্যাপার হয়েছে এই যে ভোজের কথা এখনই লোকে বিস্মৃত হয়েছে, এতে কারও উপকার হয়নি। উপরন্তু এ ধার্মাজের ছাত্র সম্প্রদায় ও বিবেকবান অধিবাসীদের দুঃখের কারণ হয়েছে।

কেউ যেন এমন কথা না ভাবেন যে ভোজ বন্ধ করা যায়নি বলে ঐ সত্যাগ্রহ ব্যর্থ হয়েছে। ছাত্ররা স্বয়ং জানত যে তাদের সত্যাগ্রহ অবিলম্বে নয়নগোচর কোন ফল প্রসব করবে না। কিন্তু নির্ভয়ে আমরা একথা ধরে নিতে পারি যে তাদের সতর্কতা বৃত্তি যদি ঘুমিয়ে না পড়ে, তাহলে ওখানে কোন শেঠিয়া ভবিষ্যতে আর শ্রাদ্ধ ভোজের আয়োজন করতে সাহসী হবে না। দীর্ঘকালের কোন সামাজিক কুপ্রথাকে একবারেই বিলুপ্ত করা যায় না, সর্বদাই এর জন্য স্থৈর্য ও ধৈর্যের প্রয়োজন হয়।

আমাদের সমাজের "গুরুজনরা" কালের ইঙ্গিত কবে বুঝতে শিখবেন ? কোন প্রথাকে সমাজ ও দেশেব উন্নতির বাহন মনে করাব বদলে আব কতদিন তারা এই প্রথার দাস হয়ে থাকবেন ? নিজ সন্তান-সন্ততিদেব তাঁরা যে জ্ঞানার্জনে সহায়তা করছেন, তার বাস্তব প্রয়োগ থেকে আর কতদিন তাঁরা ছেলেদেব নিবৃত্ত রাখতে পারবেন ? তাঁদের ন্যায়-অন্যায় বিচাব বোধকে কবে তাঁরা বর্তমানের সম্মোহন পাশ মুক্ত করে নিজেদের মধ্যে মহাজন কথাটিব সঠিক অর্থের বিকাশ সাধন করবেন ?

ইয়ং ইণ্ডিয়া ১-৩-১৯২৮

৩৬। জাতীয় বনাম বিদেশী শিক্ষা

আমি আশা করি যে তোমাদেব সাম্প্রতিক অবকাশকালে গুজরাট বিদ্যাপীঠ যে নূতন মূলনীতি গ্রহণ করেছে, সে সম্বন্ধে তোমরা অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করেছ। বহুবার আমি একথা বলেছি যে সংখ্যাবিক্য আমাদের শক্তির উৎস নয়। অবশ্য সংখ্যাধিক্যকে আমরা অবজ্ঞা কবি না ; কিন্তু সংখ্যাল্পতা আমাদের দুশ্চিন্তার কারণ হওয়া উচিত নয়। মৌলিক বিষয়াবলী সঠিকভাবে উপলব্ধি করে গ্রহণ করা এবং বিনীতভাবে তাকে রূপায়িত করার প্রচেষ্টার মধ্যে আমাদের আসল শক্তি নিহিত আছে। বিদ্যাপীঠেব প্রতি অনুগত ছাত্ররা যদি এর আদর্শানুযায়ী জীবনযাপন করে তবে অবশ্যই আমরা তাদের মাধ্যমে আমাদের স্বরাজ অর্জন করা রূপী বাঞ্ছিত আদর্শে উপনীত হব। ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং ভয়লেশ-শূন্য হয়ে আদর্শাভিমুখে অভিযান—এরই প্রয়োজন এখন সবচেয়ে বেশী। আমি চাই যে তোমরা তোমাদের শিক্ষকদের এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত কর ও প্রতিশ্রুতি দাও

যে বিদ্যাপীঠের আদর্শের পরিপূর্তির জন্য যে কোনরকম দৈব-দুর্বিপাক আসুক না কেন, তোমাদের আনুগত্য অবিচল থাকবে। সত্য এবং অহিংসা যেন আমাদের কেন্দ্র বিন্দু হয় এবং এতে যাদের আস্থা নেই তাদের স্থানও এখানে নেই।

সরকারী ও জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটি সুস্পষ্ট পার্থক্যের কথা জেনে নেওয়া যাক। আমাদের একটি ছাত্র বারদৌলির ব্যাপারে জেলে গেছে এবং আরও অনেকে যাবে। এরা বিদ্যাপীঠের গৌরব। আমাদের ছাত্রদের মনে এই জাতীয় ইচ্ছা উদিত হলেও সরকারী প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা কি এর কথা কল্পনাতেও ঠাঁই দিতে পারে? তোমাদের মত বরদৌলিতে গিয়ে বল্লভভাইকে সাহায্য করা তাদের পক্ষে সহজ নয়। তারা শুধু গোপনে সহানুভূতি পোষণ কবতে পারে। জাতীয় জীবনের সংকট মুহূর্তে যদি আমাদের আবদ্ধ ও বন্দী করে রাখা হয়, তাহলে সাহিত্য কেন্দ্রিক শিক্ষার মূল্য কি? জ্ঞান বা সাহিত্য শিক্ষা দ্বারা পুরুষত্ব-হীন করার ক্ষতিপূরণ করা যায় না।

ওদেব এবং আমাদের শিক্ষাপদ্ধতিব মধ্যে আকাশ পাতাল তফাৎ। আমরা ওদের মত করে ইংবাজী শেখাই না। ইংবাজীব কাজ চলা গোছের জ্ঞান আমরা দিতে পারি। কিন্তু জাতিগত ভাবে আত্মহত্যা না করে নিজের মাতৃভাষার প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করতঃ আমরা ইংবাজীকে আমাদের চিন্তার বাহন করতে পারি না। আমাদের জাতীয় প্রতিষ্ঠানে আমরা এই ক্ষতিকর প্রথা সংশোধন করতে চাই। শিক্ষণীয় প্রত্যেকটি বিষয় আমাদের গুজরাটীর মাধ্যমে শিখতে হবে। একে সমৃদ্ধ করে সর্বপ্রকারের চিন্তা ও ভাবধারা প্রকাশের উপযুক্ত করে তুলব। কুত্রাপি আমরা এদেশের মত ব্যাপার দেখি না। এই কয় বৎসর ইংরাজীর মাধ্যমে সবকিছু শিক্ষা করার জন্য আমাদের উচ্চমূল্য দিতে হয়েছে। আমরা কর্তব্যচ্যুত হয়েছি।

এরপর অর্থশাস্ত্র শিক্ষা দেবার প্রণালীর কথা ধর। সরকারী প্রতিষ্ঠানের বর্তমান পদ্ধতি আতঙ্কজনক। প্রত্যেক দেশের নিজস্ব অর্থশাস্ত্র রয়েছে। জার্মান পাঠ্যপুস্তকগুলি ইংরাজী পাঠ্যপুস্তক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অবাধ বাণিজ্যাধিকার ইংলণ্ডের বাঁচার উপায় হতে পারে। আমাদের কাছে এ কিন্তু মৃত্যুতুল্য। ভারতীয় অর্থশাস্ত্র রচনা করার কাজ এখনও বাকি আছে।

ইতিহাসের ক্ষেত্রেও ঐ একই ব্যাপার। কোন ফরাসী দেশীয় ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখলে নিজের মত করে তা লিখবে। ইংরেজরা আবার সম্পূর্ণ পৃথকভাবে লিখবে। ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধের বিবরণ লেখক অনুসারে ভিন্ন হবে। কোন ভারতীয় দেশপ্রেমিক কর্তৃক মূল সূত্রাবলম্বনে লিখিত